দূরেক্ষণ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল চক্রবর্তী পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন ও ছবি এঁকেছেন শিল্পী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। —লেখক

ফাল্গুন, ১৩৫৫

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

ঐতিহাসিক ভূমিকা—

মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তথা ইন্দ্রিয়ের শক্তি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকবে, স্রষ্টার এই ছিল পরিকল্পনা। আমাদের পায়ে-চলা গতি মন্থর, বাহুর জোর পরিমিত, শ্রুতির গোচরে আসে সেই শব্দ যেগুলো নিতান্ত কানের একটা বাঁধাধরা সীমার মধ্যে। নয়ন শক্তিমান কেবল স্বল্প পরিধির অভ্যন্তরে। কিন্তু বিধাতার কৃপণ হস্তের দানে মানুষের প্রয়োজন মেটে নি, তপস্যার বলে বিজ্ঞানী সীমার বাঁধন কেটে চলেছে।

গ্রেহাম বেল্ টেলিফোন নির্মাণ করে দূরের শব্দকে কানের কাছে পৌঁছে দিলেন, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা তাতে বাড়ল কিন্তু মানুষের চাহিদার শেষ হল না। আদিকাল থেকে মানুষ দিব্যদৃষ্টি লাভের স্বপ্ন দেখে এসেছে, তার কল্পলোকে স্থান পেয়েছে দৃষ্টির বহির্ভূতকে নয়নগোচর করবার কাহিনী, কবে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের দৃশ্যাবলী দেখতে পেয়েছিলেন দৃষ্টির অন্তরাল থেকেই। টেলিফোন আবিষ্কার দিব্য-দৃষ্টিলাভের বাসনাকে উগ্রতর করে তুলল। দূর থেকে যার বাঁশি শুনেছি, মনে হল দূরে বসেই তাকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ কি হবে না? শ্রবণ যদি ধন্য হল, নয়নই বা বঞ্চিত থাকবে কেন? অন্তরালকে অগ্রাহ্য ক'রে দূরের দৃশ্য চোখে দেখার সাধনায় একদা সিদ্ধিলাভ করলেন জন্ বেয়র্ড। কৃত্রিম একটা মানুষের মাথা যন্ত্রের সামনে বসিয়ে পার্শ্ববর্তী আর একটা ঘরে যন্ত্রসংলগ্ন পর্দায় তারই একটা প্রতিচ্ছায়া দেখবার চেষ্টা করছিলেন বেয়র্ড। একদিন সত্যিই তিনি তা দেখতে পেলেন। সেই চরম সাফল্যের কাহিনী বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাজ করে চলেছি, পরীক্ষাকার্যের জন্য যে নকল মূর্তিটি ব্যবহার করছিলাম, সেদিন তারই একটা প্রতিলিপি দেখতে পেলাম যন্ত্রের পর্দায়। কিন্তু সে কেবল ছায়া মাত্র নয়, একটা সত্যিকার প্রতিকৃতি। আলো-কালোর সূক্ষ্ম তারতম্য দিয়ে গড়া নিখুঁত একটা ছবি। চরম মানসিক উত্তেজনা নিয়ে নীচে ছুটে

গেলাম, জীবন্ত কোনো কিছু ধরে আনতে। সামনে পেলাম নীচেকার অফিসের বালকভৃত্যকে, নাম তার উলিঅম টেঅনটন। তাকে কোনো-রকমে রাজি করে ধরে নিয়ে এসে বসিয়ে দিলাম আমার সেই প্রেরক-যন্ত্রের সামনে। পাশের ঘরে এলাম যন্ত্রের পর্দায় তার প্রতিমূর্তি দেখবার আশায়। কিন্তু এ কী, পর্দা যে একেবারে ফাঁকা! অনেক চেষ্টা করেও এতটুকু দাগ সেখানে দেখতে পেলাম না। বুদ্ধি গুলিয়ে গেল, মনে এল নৈরাশ্য। তাই নিয়ে ফিরে এলাম আবার এদিককার ঘরে। সেখানে যাওয়ামাত্রই টের পেলাম কোথায় রয়েছে গলদ। বালকটি উজ্জ্বল আলোকের সামনে বসতে ভয় পেয়ে যন্ত্র থেকে কয়েক গজ দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। তাকে একটা অর্ধক্রাউন বকশিস্ দিয়ে বুঝিয়ে বললাম, কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই এতে। অনেক করে বলবার পর সে আবার যন্ত্রের সামনে গিয়ে বসল। পাশের ঘরে গিয়ে এবার দেখতে পেলাম পর্দায় ফুটে উঠেছে বালকের পরিষ্কার প্রতিমূর্তি। কিন্তু একথা মনে করলে বিস্ময় লাগে যে সর্বপ্রথম যে-মানুষ যন্ত্রের সামনে বসে অন্তরালকে অগ্রাহ্য করেই নিজের প্রতিমূর্তি দূরবর্তী পর্দায় উদ্ভাসিত করবার সৌভাগ্য লাভ করল তাকে নগদ দক্ষিণা না দিয়ে যন্ত্রের সম্মুখীন হতে রাজি করানো গেল না।

কিন্তু এ হল নাটকের পঞ্চমাঙ্কের কাহিনী। তার আগেও রয়েছে অনেক কিছু। মৃত্তিকা ভেদ করে উদ্ভিদ্‌শিশু যে প্রভাতে প্রথম আলোককে অভিবাদন করে তার আত্মপ্রকাশের বিবরণীর সেটা সূচনাও নয় পরিণতিও নয়, তার পূর্বে রয়েছে কত না সংগ্রামের ইতিহাস— যা ঘটেছে লোকচক্ষুর অগোচরে, বীজাভ্যন্তরে তথা মাটির নীচে।

অন্তরালবর্তীকে দৃশ্যমান করে তোলবার পরিকল্পনা স্বপ্ন থেকে বাস্তবের পথে পা বাড়িয়েছিল এরও অর্ধশতাব্দী পূর্বে, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে; যেদিন সেলেনিঅম-নামক ধাতুদ্রব্যের মধ্যবর্তিতায় আলোককে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তর করবার তত্ত্ব জানতে পেরেছিলেন ভ্যালেন্‌শিয়া

কেব্‌ল্ স্টেশনের কর্মচারী মে। এই আবিষ্কারের পরেও বহুকাল দূরেক্ষণ (television) কার্যকরী রূপ পায় নি। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে সেলেনিঅমের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে কর্ন্‌-নামক জার্মানীর এক ব্যক্তি রাজা সপ্তম এডওআর্ডের একখণ্ড ছবিকে টেলিগ্রাফের তারের সাহায্যে দূরে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ছবি পাঠাতে সময় লেগেছিল বিশ মিনিট। কিন্তু এই পদ্ধতিদ্বারা কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য, বাস্তব ঘটনা বা জীবন্ত প্রাণীর মূর্তি দূরবর্তী পর্দায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না। সেজন্য দরকার ছিল আলোর সূক্ষ্ম ইতর-বিশেষকে আরও স্পষ্ট করে জানবার ব্যবস্থার। আপতিত আলোর প্রতিক্রিয়ায় সেলেনিঅম যে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে তা খুবই ক্ষীণজীবী, আছে কি নেই তা টের পাওয়া শক্ত। প্রয়োজন ছিল এমন ব্যবস্থার যদ্দারা মৃদু তড়িৎপ্রবাহকে শক্তিশালী করা চলবে।

হার্জ আবিষ্কার করেছিলেন (১৮৮৭) বেগনি-পারের আলোর প্রভাবে ধাতুপদার্থ থেকে ইলেকট্রন মুক্ত করবার তত্ত্ব। হার্জের আবিষ্কৃত সত্যকে অবলম্বন করে হাল্‌ভ্‌ওআশ, রিঘি, স্টোলটো প্রমুখ কর্মিগণ ফোটো-সেল নির্মাণ করেন, যা দিয়ে বেগনি-পারের রশ্মির সাহায্যে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা যেত। তারপর এলস্টার ও গাইটেল (১৮৮৯) পরীক্ষায় পেয়েছিলেন যে দৃশ্যমান আলোর প্রভাবে সোডিঅম পটাশিঅম প্রভৃতি ধাতু থেকেও ইলেকট্রন মুক্ত করে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা যেতে পারে। এঁদের প্রচেষ্টাতেই বিংশ শতকের সূচনাতে আলোর তীব্রতার ইতর-বিশেষকে অনুরূপ তড়িৎপ্রবাহে পরিবর্তিত ও রূপায়িত করবার কার্যকরী ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছিল।

এই সময়ে হার্টজ সন্ধান দিয়েছিলেন কী করে তড়িৎতরঙ্গ উৎপন্ন করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্রের নামও চিরবিজড়িত থাকবে। তারপরে ফ্লেমিং আবিষ্কার করেছিলেন বৈদ্যুতিক ভাল্‌ভ্‌। তড়িৎতরঙ্গরূপে তড়িৎশক্তি সংবাহক-তার ছাড়াও চলাচল করতে পারে এবং ভাল্‌ভের সাহায্যে ক্ষীণতম তড়িৎপ্রবাহকে ইচ্ছামতো বিবর্ধন করা চলে।

বিংশ শতকের প্রারম্ভে এমনি পটভূমিকার সম্মুখীন হয়ে য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের কর্মিগণ দূরেক্ষণকে কার্যকরী করবার চেষ্টায় নিয়োজিত হলেন, তৎপূর্বেই মার্কনি বেতার-টেলিগ্রাফ চালু করেছেন। এই কর্মিদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাফল্য লাভ করলেন স্কটল্যাণ্ডের জন্ বেঅর্ড।

ছেলেবেলা থেকেই বেঅর্ডের আবিষ্কারের ঝোঁক ছিল। সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবার জন্য তিনি নিজের গ্রামে টেলিফোনের লাইন বসিয়েছিলেন। কিছুদিন তিনি গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়াল টেক্‌নিক্যাল কলেজে পাঠাভ্যাস করেছিলেন। প্রথম মহাসমরের সময়ে তিনি কাজ করছিলেন স্কটিশ ইলেক্‌ট্রিক কমিশনের অধীনে ক্লাইড ভ্যালি ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার্ কোম্পানির সহকারী অধ্যক্ষ হিসাবে। তিনি সামরিক কার্যে যোগ দিতে চাইলেন, শারীরিক অনুপযুক্ততার জন্য তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। এই ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত চাকুরিতেও ইস্তফা দিতে হল। দূরেক্ষণ নিয়ে তখন বিজ্ঞানজগতে বেশ একটা ঔৎসুক্য জেগেছে ও কর্মতৎপরতা চলেছে। বেঅর্ড এই কার্যে ব্রতী হলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে তাঁকে অর্থকরী কিছু-একটা অবলম্বন করতে হল। তিনি মন দিলেন ব্যবসায়ে। বহু রকম ব্যবসায় একটার পর একটা ধরলেন ও ছাড়লেন। মোজা মধু সাবান প্রভৃতির ব্যবসায় করলেন এবং তাতে বেশ লাভও হচ্ছিল, কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্য তাঁকে কোনো কিছুই করতে দিল না। ব্যবসায় ছেড়ে তিনি আবার মন দিলেন দূরেক্ষণযন্ত্র-নির্মাণে।

হেস্টিংস শহরের ক্ষুদ্র এক গৃহকোণে তিনি যন্ত্রপাতি নিয়ে বসলেন। ছয় মাসের ভিতরেই তিনি এমন এক যন্ত্র নির্মাণ করলেন যাতে কোনো বস্তুকে যন্ত্রের সামনে বসিয়ে তার একটা ছায়ামূর্তি দূরবর্তী যন্ত্রে ফুটিয়ে তোলা চলত। অবশ্য এই ছায়া খুব স্পষ্ট ছিল না, তাকে ছবি বলাও চলে না। সেদিনকার সে যন্ত্র ছিল নেহাৎই খেলো— একটা পুরনো কাঠের বাক্‌স, খালি একটা বিস্কুটের পেটিকা, দশ পেন্সের বেশি দাম নয় এমনি একটা লেন্স এবং ছয় শিলিং মূল্যের একটা খেলনা ইলেক্‌ট্রিক

মোটরযন্ত্র— এই ত সরঞ্জাম। আরও এক বৎসর পরে বেঅর্ড সাদাসিধে জিনিসের সাদা-কালোয় আঁকা বেশ স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হলেন। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বেঅর্ড চলে এলেন লণ্ডনে এবং জটিল দৃশ্যের চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হলেন।

নূতন উদ্যমে কাজ করতে গিয়ে আর্থিক অভাবে তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন। দু বেলা খাবার জোটানোই তাঁর পক্ষে মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। যন্ত্রের আসবাবপত্র কেনবার সামর্থ্য কোথায়? জীর্ণমলিনবেশে তিনি অর্থের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন লণ্ডনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। কিন্তু দূরেক্ষণকে লোকে তখন অবাস্তব কল্পনা বলেই মনে করত, সুতরাং সে কাজে অর্থ ঢালা দুর্বুদ্ধির নামান্তর বলেই সবাই মনে ক'রেছিল। অবশেষে তিনি স্বীয় বন্ধুদের দ্বারস্থ হলেন। এঁদের আনুকূল্য পেয়ে বেঅর্ড নবতম যন্ত্র নির্মাণ করলেন এবং তা সাধারণ্যে উপস্থিত করলেন।

রয়াল ইনস্টিটিউশনের সভ্যদের আমন্ত্রণ করা হল এক প্রদর্শনীতে উপস্থিত হতে। পঞ্চাশ জন সভ্য আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। কিন্তু বেঅর্ডের গবেষণাকক্ষ এতই ক্ষুদ্র ছিল যে সেখানে ছয় জনের বেশি বসবার জায়গা হয় না, সুতরাং ছোটো ছোটো দল করে নিতে হল। একটি কক্ষে যন্ত্রের সামনে যে সব ঘটনা ঘটছিল তারই হুবহু চিত্র চলচ্চিত্রের মতো ক্রমাগত উদ্ভাসিত হল নীচতলার এক কক্ষে রক্ষিত যন্ত্রের পর্দায়। সেদিনকার প্রদর্শনী দেখে ফ্যারাডে-হাউসের সর্বাধ্যক্ষ ডক্টর রাসেল্ বলেছিলেন—

> যদিও সিনেমা-পর্দায় প্রদর্শিত ছবির সঙ্গে এই ছবির তুলনা করা চলে না তবুও মূলের সহিত প্রতিকৃতির সাদৃশ্য নিখুঁত। সকল প্রকার অঙ্গভঙ্গি একেবারে নির্ভুল হয়ে ফুটে উঠেছে। এই সর্বপ্রথম আমরা সত্যিকার দূরেক্ষণের পরিচয় পেলাম।

সেদিনকার দূরেক্ষণযন্ত্রের ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ কেবল্ এক ঘর

থেকে অন্য ঘরে দৃশ্য পাঠানো চলত। ধীরে ধীরে বেঅর্ড যন্ত্রের উন্নতি করে চললেন— ক্রমে তার পাল্লা বাড়তে লাগল। পর্দার ছবিও ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠল, এক খণ্ড কাগজের নোটের সকল খুঁটিনাটি অংশ পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হলেন বেঅর্ড। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে বেতারদৃষ্টি তাঁরই হাতে সাগর পাড়ি দিয়ে পৌঁছল লণ্ডন থেকে নিউইয়র্কে।

বেঅর্ডের চেষ্টায় দূরেক্ষণের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান হল, পরবর্তীদের হাতে রইল তাকে সহজ ও সুন্দর করে তোলবার ভার। কিছুদিনের মধ্যেই ক্যাথোড-রশ্মি বৈজ্ঞানিক জগতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসল। ক্যাথোড-রশ্মির সাহায্য নিয়ে দূরেক্ষণযন্ত্রকে নব রূপে নির্মাণ করলেন জোরিকিন তথা ফার্নস্‌ওআর্থ। বেঅর্ডের যন্ত্রের সঙ্গে অতিআধুনিক দূরেক্ষণযন্ত্রের বিশেষ সাদৃশ্য না থাকলেও বেঅর্ডের উদ্ভাবিত কৌশলকে অবলম্বন করেই পরবর্তী যন্ত্রগুলি পরিকল্পিত হয়েছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

আলো ও দর্শনানুভূতি

চোখ খুললেই বিশ্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়। কেউ যদি দেখতে ভুল করে তাকে গাল দিয়ে বলা হয়, চোখ থাকতে অন্ধ। কিন্তু চোখ থাকতে অন্ধ সকলেই, তাতে অগৌরবের কিছু নেই। অন্ধকার ঘরে বসে দৃষ্টির বড়াই করা কারও পক্ষেই চলবে না। আলো যেখানে নেই চোখ সেখানে নিষ্ক্রিয়, তাই আলোর অভাবকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে অন্ধকার— চোখকে সে অন্ধই করে দেয়। এ কথাটা সহজেই বোঝা যাবে যে দেখবার জন্য চোখদুটো থাকলেই শুধু চলবে না, আরও কিছুর প্রয়োজন যার প্রভাবে চক্ষু সক্রিয় হয়ে উঠবে। যার প্রভাবে চোখ কার্যকরী হ'য়ে ওঠে, তারই নাম আলো। আলোর এমন একটা শক্তি রয়েছে যার ফলে সে চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ ক'রে বোধশক্তিকে জাগ্রত করতে পারে।

সূর্য থেকে আলোর উৎপত্তি হয়ে থাকে, প্রদীপ জেলেও আলো সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু অন্ধকার ঘরে প্রদীপ জাললে কেবল যে প্রদীপের শিখাটুকুই দেখা যায় তা নয়, ঘরের আরো অনেক-কিছুই তখন দেখতে পাওয়া যায়। সবিতার আত্মপ্রকাশ নিজের প্রয়োজনে আর কতটুকু, বিশ্বভুবনের রূপ উদ্ঘাটিত করবার জন্যই মুখ্যত। আলো জাল্‌বার পর ঘরের সব জিনিস দেখা গেল কেন? রাতের অন্ধকারে যারা অদৃশ্য ছিল সূর্যোদয়ে তাদেরই-বা কি রূপান্তর ঘটল? আলোর স্বরূপ বিচার করলে এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

এখানে পদার্থকে দু ভাগ করে নিলে বুঝতে সুবিধা হবে, যাদের নিজেদের আলো নেই তারা জ্যোতিহীন; যারা নিজেরা আলো সৃষ্টি করছে, যেমন সূর্য বা প্রদীপ, তারা জ্যোতিষ্মান্‌। আলোর উৎস বা জ্যোতিষ্মান্‌ বস্তু থেকে আলোর রশ্মি নির্গত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলোরশ্মি কি ব্যাপার সে সম্বন্ধে সেকালের বিজ্ঞানীদের মত ছিল এক রকম, পরবর্তীরা তাকে অগ্রাহ্য করে নতুন মতবাদ এনেছেন। আলোর উৎস ঢিলের মত কণিকা ছুঁড়তে থাকে, সেই কণিকা চোখে এসে আঘাত

করলে আলোর অনুভূতি জন্মে— নিউটনের যুগে এ রকম বিশ্বাস করা হত। পরবর্তী কালের পণ্ডিতেরা এই মতবাদ বদলিয়ে নতুন মত ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁদের মতে আলোর উৎসের শক্তিব্যয়ে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে, সে ঢেউ চোখের রন্ধ্র দিয়ে পথ করে নিতে পারলেই আলোর অনুভূতি জাগে। এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ঈথর বলে একটা মাধ্যমের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল। আধুনিক কালে তাকে অস্বীকার করেও অসুবিধা হচ্ছে না। তবে আমরা তাকে স্বীকার করেই নেব। ঈথর-সমুদ্রকে উদ্বেলিত করে ঢেউ এসে যে পথে চোখে প্রবেশ করবে বা কোনো-কিছুর উপরে পড়বে, তাকেই বলি রশ্মি। ঢেউ মাত্রেরই দুটো বৈশিষ্ট্য থাকবে, তার উচ্চতা কম-বেশি কিংবা দৈর্ঘ্য ছোটো-বড়ো হতে পারে। ঢেউয়ের উচ্চতার পরিমাণ দিয়ে নির্ণীত হবে রশ্মির তীব্রতা, আর দৈর্ঘ্যের আকারভেদে বদলাবে আলোর রং— লাল হলদে নীল সবুজ প্রভৃতি। সব আকারের ঢেউ এক সঙ্গে এসে হাজির হলে আলোর রং হবে শাদা।

আকাশে সূর্য উদিত হলে কিংবা গৃহাভ্যন্তরে প্রদীপ জাললে সেখান থেকে ঢেউয়ের আকারে রশ্মিপথ দিয়ে আলোকদূতেরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে। এদের মধ্যে যারা চোখের ভিতর দিয়ে চলে যাবে মস্তিষ্কের অনুভূতি-কেন্দ্রে, তারাই জানিয়ে দেবে উৎসের অস্তিত্ব। তা ছাড়া যারা রইলো তাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো জ্যোতিহীন বস্তুর উপরে এসে পড়ে তবে তাদের দু রকম পরিণতি ঘটতে পারে। কতকাংশ ওখানেই থেকে যেতে পারে, আর খানিকটা ঠিকরে আবার চারদিকে ছড়িয়ে যেতেও বাধা নেই। এ ভাবে ফিরে-আসা ভগ্নদূতেরা যখন চোখে এসে পৌঁছুবে তখনই জ্যোতিহীন বস্তুটিও পরোক্ষভাবে জ্যোতিষ্মান্ হয়ে উঠবে। যাদের নিজের আলো সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই তারা এমনি করে ধার-করা আলোতে আত্মপরিচয় দিতে পারে। কোনো-একটা জিনিসের কোন্ জায়গায় কতটা আলো পড়বে, আবার তা থেকে কতটা অংশই বা ফিরে আসতে সক্ষম হবে তা নির্ভর করবে জিনিসটির অবস্থান ও স্বভাবের উপর। যে জিনিস সবটুকু আপতিত আলোককে বন্দী করে রেখে দেবে সূর্যালোক

পেলে বা আলো জ্বাললেও সে জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠবে না, এমনই পদার্থকে বলি কালো। রূপকথার রাক্ষসীর মতোই সে নিষ্ঠুর, তার কবল থেকে কারও নিস্তার নেই। কালো জিনিস জ্যোতিষ্মান্ না হলেও কিন্তু ওদের দেখা যাবে, যদি ওদের পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা পট-ভূমিতে অন্য জাতের পদার্থ থাকে যারা কালো নয়। 'নিশাকর নিজে তেজোময় নয়'— সূর্যালোকের দাক্ষিণ্যেই তার আত্মপ্রকাশ। তার অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করলেই সব তত্ত্ব সহজ হবে। চাঁদের গায়ের যে কলঙ্ক সে এমনই আলোর পাশে কালোর ব্যাপার। চন্দ্রমণ্ডলের যে জায়গা থেকে আলো ফিরে এল তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এবং যে অংশ মোটে আলো পায় নি, কিংবা পেয়ে থাকলেও সে-আলোককে সম্পূর্ণ গ্রাস ক'রে ফেলেছে, এই উজ্জ্বলতার পটভূমি তাকে প্রকাশিত ক'রে দিল।

যে বস্তুর উপর থেকে সবটুকু আপতিত আলো ফিরে আসে সে শাদা দেখায় কিংবা যখন যে আলোতে উদ্ভাসিত হয় তখন সেই আলোর বর্ণ গ্রহণ করে। রং-ওয়ালা বস্তুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার ফলে সে একটি বিশেষ রঙের আলোক ভিন্ন অন্য সব আলোককে বন্দী করে রাখতে পারে। মোটের উপর দর্শনানুভূতি-বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে কোনো বস্তুর বিশেষ আকৃতি যে চোখের সামনে ফুটে ওঠে তার কারণ ওর সব জায়গা থেকে সমান আলো ঠিকরে আসে না। কোনো বস্তুর বিভিন্ন অংশ থেকে আপতিত আলো যে বিশেষ ধরণে ফিরে আসে সেই বিন্যাস বা বৈশিষ্ট্যটাই তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে। এই তত্ত্বটাকে আরও একটু বিশদ করে বলা যেতে পারে।

চিত্রকর তুলির আঁচড়ে পটের উপরে ফুটিয়ে তুলছেন কত না রূপবৈচিত্র্য। দুটো মানুষের ছবিকে পাশাপাশি বিচার করলে দেখা যাবে যে রক্তমাংসের পরিচয়কে বাদ দিলেও মানুষকে চেনবার কোনো অসুবিধা হয় না। এই উপলব্ধির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে নিছক কালির আঁচড়ের বিন্যাসের বৈষম্য ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। কেবল শাদা-কালোর বিশিষ্ট সমাবেশেই ফুটে উঠেছে রূপের গোপন রহস্য। আরও একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে শাদা-কালোর সমাবেশের

তারতম্য প্রকৃতপক্ষে বিক্ষিপ্ত আলোর পরিমাণ কমবেশি করেছে মাত্র এবং তা থেকেই হচ্ছে দর্শনানুভূতির পার্থক্য।

চোখের সামনে ব্যক্তিবিশেষকে দেখছি। তাকে চিনি তার মুখ দেখে। কিন্তু এই চেনবার রহস্য কি? মুখের উপর যে আলো পড়ে তা সব জায়গায় কিন্তু সমান নয়; আবার মুখের কোনো জায়গা থেকে হয়ত আলো খুব বেশি করে ফিরে এল, কোনো স্থান থেকে কিছুই এল না। বিক্ষিপ্ত আলোর এই তারতম্য ব্যক্তিবিশেষের মুখের নিজস্ব আকৃতি বর্ণ ভঙ্গী ও গড়নের উপর নির্ভর করবে। নাক চোখ কপাল তথা অন্যান্য দেহাংশ থেকে যে রকম আলো ফিরে এল তারা দর্শকের চোখের ভিতর গিয়ে অতি ক্ষুদ্র অথচ অবিকৃত ও অবিকল আলোছায়ার প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করলো চোখের আভ্যন্তরীণ একটা পর্দায়, যার নাম দেওয়া হয়েছে অক্ষিপট (retina)। এই অক্ষিপটের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন রকম আলো এসে পড়ছে এবং এখানকার আলোর অনুভূতি পৌঁছয় মস্তিষ্কে। অক্ষিপটের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে সহস্র সহস্র জীবন্ত কোষ, যারা আপতিত আলোর তীব্রতানুযায়ী উত্তেজনা পায় এবং সে উত্তেজনার সাড়া নার্ভ-বাহিত হয়ে মস্তিষ্কে গমন করে।

কোনো বস্তুর সঙ্গে দৃষ্টি-পরিচয়ের অর্থটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, তার উপরে আলো পড়বার পর সেখান থেকে যে রকমারি আলো ঠিকরে এল সেই প্যাটার্নকে এককালে সমগ্রভাবে ও যথাযথরূপে জেনে নেওয়া। অক্ষিপটের এমনই জেনে নেবার শক্তি রয়েছে। কিন্তু মানুষও এমন যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে আপতিত আলোর প্রতিলিপি বা ছাপ তুলে নেওয়া হচ্ছে।

চক্ষুর কার্য ও গঠনপ্রণালী অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে চোখের সম্মুখে রয়েছে ক্ষুদ্র একটি লেন্স। এই লেন্সের কার্যকারিতায় কোনো বস্তু থেকে যে আলো এসে চোখে পড়বে তা পেছনের দিকে গিয়ে মিলিত অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত হলে সেই রশ্মিগুলো অক্ষিপটে একটি আলোর প্রতিকৃতি বা সদ্‌বিম্ব (real image) গড়ে তুলবে। এই যন্ত্রকে অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে ফোটো তুলবার ক্যামেরা-যন্ত্র। ক্যামেরা গঠনরীতির

দিক দিয়ে চক্ষু থেকে অভিন্ন। ক্যামেরার সামনে যে লেন্সখানা থাকে তারই গুণে কোনো বস্তু হতে বিক্ষিপ্ত রশ্মি পেছনের দিকে আলোর তারতম্য মিশিয়ে একটা ছবি তৈরি করে। এই ছবিকে চিরন্তন করে রাখবার জন্য এটাকে ফেলা হয় এমন একটি পর্দার গায়ে যেখানে আলোর প্রভাবে পর্দার উপাদানের উপর রাসায়নিক ক্রিয়া

চিত্র ১ — চক্ষুর কার্যপ্রণালী
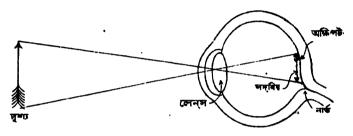
ঘটে। আলো যেখানে উজ্জ্বল সেখানে রাসায়নিক ক্রিয়া প্রবল, আলো যেখানে নেই সেখানে পর্দার উপাদান অবিকৃত রয়ে গেল। অক্ষিপটে যে প্যাটার্নটি সাময়িকভাবে মস্তিষ্কের অনুভূতিকেন্দ্রকে উত্তেজিত করত, ক্যামেরায় তারই ছাপ এঁকে নেওয়া হল ফোটো-প্লেটে— এর নাম ফোটো-নেগেটিভ। একে ব্যবহার করেই তৈরী করা হবে শাদা-কালোয় আঁকা ছবি। একখণ্ড ফোটোকে বিচার করলে দেখা যাবে যে চিত্রকরের ছবির মতনই এতে কেবল শাদা-কালোর বিচিত্র সমাবেশ, শাদার পটভূমিতে কোনো স্থানে হয়ত একটু কম কালো, অন্য কোনো জায়গায় কালিমাটা বেশ জমকালো। কোনো দৃশ্য ব্যক্তি বা অন্য কিছুকে চোখে দেখা বা তার ফোটো তোলা, এই উভয় কার্যেরই মূলতত্ত্ব হচ্ছে সেখান থেকে যে রকম বিন্যাস করে আলো বিক্ষিপ্ত হয়ে আসছে তারই ছাপ তুলে নেওয়া, সে অক্ষিপটেই হোক বা ফোটো-প্লেটেই হোক। মনে রাখতে হবে যে কোনো দৃশ্যকে দূরবর্তী স্থানে পাঠাতে হলে দৃশ্য থেকে বিক্ষিপ্ত আলোছায়ার প্যাটার্নকেই যে-কোনো উপায়ে হোক হুবহু চালান করে দিতে হবে।

তাড়িত ক্রিয়ায় আলোর প্রভাব

আলোর ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য উপলব্ধি করবার ক্ষমতা দর্শনানুভূতির মূল রহস্য। অক্ষিপটের সে গুণ আছে। জীবন্ত কোষকে বাদ দিলেও জড়পদার্থের এমন ক্ষমতার কথাও একদা আবিষ্কৃত হয়েছিল। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে এমন পদার্থ আছে যার উপর আলো পড়লে তার রাসায়নিক রূপান্তর ঘটে। এই তথ্যকে অবলম্বন করেই ফোটো-চিত্র তোলবার ব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছে। কোনো দৃশ্য ব্যক্তি বা ঘটনার ফোটো তুলে তাকে দূরে পাঠানো সম্ভব এবং এক জায়গার ঘটনার স্বরূপ অন্যত্র জানিয়ে দেওয়া চলতে পারে, কিন্তু এ কার্য সময়সাপেক্ষ। এর সাহায্যে যখনকার ঘটনা তখনই তাকে দূরের দর্শকের সামনে উপস্থিত করা চলবে না। সে কার্যের জন্য তড়িতের আশ্রয় চাইতে হবে।

তড়িতের ধর্ম আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, তড়িৎশক্তিকে তারের মধ্যবর্তিতায় কিংবা বেতারে স্থানান্তরে পাঠানো সম্ভব এবং এতে নিমেষের মধ্যে কোনো তড়িৎসংকেতকে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে পৌঁছনো চলতে পারে। শব্দের প্রভাবে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে বা তার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে অনেক দিন আগেই শব্দকে তড়িতের মারফতে এক স্থান থেকে অন্যত্র পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। আলোককেও অনুরূপ কৌশলে দূরে পাঠানো যেতে পারে যদি তাকে তড়িতের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তড়িতের উপর আলোর প্রবাহের কথা বহু দিন অজ্ঞাত ছিল।

ধাতব পদার্থমাত্রেই তড়িৎসংবাহকরূপে কাজ করে। পদার্থের এই সংবহনক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে, যেমন উত্তপ্ত অবস্থায় অধিকাংশ ধাতুরই সংবহনক্ষমতা কমে। সেলেনিঅম-নামক পদার্থের একটা বিশেষ গুণের কথা জানা গিয়েছিল, এর উপরে আলো ফেললে রশ্মির তীব্রতা অনুযায়ী এই পদার্থের তড়িৎসংবহনক্ষমতা বেড়ে যায়। এরূপ পদার্থকে তড়িৎসংবহনের কার্যে নিয়োজিত করে আলোর ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তনকে

তড়িৎপ্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধিতে রূপান্তর করা চলতে পারে। আরও একটা প্রক্রিয়ায় আলোর সাহায্যে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে খানিকটা ভূমিকা করে নিতে হবে।

পদার্থের পরমাণুর মৌলিক উপাদান মোটামুটি তিন জাতের— প্রোটন ইলেকট্রন ও নিউট্রন। এদের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রন ভারি কণিকা, অন্তত ইলেকট্রনের চেয়ে এ দুটোর ভার অনেক বেশি; ইলেক্‌ট্রন সব চেয়ে হালকা। এদের যে বিশেষ গুণপনা আছে, তার প্রকাশ থেকেই তড়িতের জন্ম। বিজ্ঞানের ভাষায় এই গুণপনার সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয় প্রোটন পজ়িটিভ-তড়িৎগ্রস্ত ও ইলেট্রন নেগেটিভ-তড়িৎগ্রস্ত। বিপরীতধর্মী ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং এরা সমান সংখ্যায় একত্রিত থাকলে তড়িতের অভিব্যক্তি দেখা যায় না। প্রোটনের বাঁধন বা আকর্ষণ থেকে মুক্ত ইলেক্‌ট্রন যখন দল বেঁধে কোনো সংবাহক-তারের ভিতর দিয়ে চলতে থাকে তখনই তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। নানা রকম কৌশলে পরমাণুর থেকে বের করে এদের ভ্রাম্যমাণ করা চলতে পারে। যে যন্ত্রের সাহায্যে ইলেক্‌ট্রনকে এই ভাবে মুক্ত ও গতিশীল করে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা যায় তাকে বলে ইলেক্‌ট্রিক সেল্‌ বা তড়িৎকোষ। একেবারে অনাড়ম্বর ব্যবস্থায় তামা ও দস্তার দুটো পাতকে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে ওদের বাইরের দিক থেকে তার দিয়ে জুড়ে দিলে এই তারে দস্তা থেকে তামায় ইলেক্‌ট্রন চলবে। তবে চলতি নিয়মানুযায়ী বলা হবে তামার পাতটি পজ়িটিভ, তড়িৎপ্রবাহ চলছে তামা থেকে দস্তায়— এটা নেগেটিভ। এখানে রাসায়নিক ক্রিয়া তড়িৎপ্রবাহের শক্তি জোগায় অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রনকে পরমাণু থেকে মুক্ত করে আনে· রাসায়নিক পরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রেরণা। অন্য রকম কৌশলেও পরমাণু থেকে ইলেক্‌ট্রনকে বের করে নিয়ে আসা যায়, তাই তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করবার আরও ব্যবস্থা আছে।

তাপ প্রয়োগ করলে অনেক পদার্থের পরমাণু ইলেক্‌ট্রন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। দেখা গেছে সিজিঅম পটাশিঅম রুবিডিঅম প্রভৃতি

পদার্থ আলোর প্রভাবেও ইলেক্‌ট্রন মুক্ত করে দেয়, শুধু তাই নয় আলোর ঔজ্জ্বল্য যত বাড়ে বিমুক্ত ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যাও তত বেড়ে চলে। সিজিঅমের এই গুণকে ব্যবহার করে আলোর সহায়তায় তড়িৎপ্রবাহ পাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে যে যন্ত্রে তার নাম ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক সেল্ বা সংক্ষেপে ফোটো-সেল— বাংলায় অনুবাদ করলে বলতে হবে আলো-তড়িৎকোষ বা শুধু আলোকোষ।

একটি বায়ুশূন্য কাঁচ-গোলকের ভিতরে সামনাসামনি করে দুখানা ধাতব পাত রাখতে হবে, যেন একটির সঙ্গে অপরটির কোনো যোগাযোগ না থাকে। এই পাতের একটিতে সিজিঅমের প্রলেপ বা আস্তর দেওয়া থাকবে, অন্যটি হবে জালের আকারে তৈরি, ইংরেজী ভাষায় যার নাম দেওয়া হয়েছে গ্রীড (grid)। কোনো তড়িৎকোষের পজ়িটিভ দিকটা গ্রীডের সঙ্গে ও নেগেটিভ দিকটা সিজিঅম-মাখানো পাতের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। এখন গ্রীডের দিকটাকে বলা হবে অ্যানোড ও সিজিঅম-পাতের প্রান্তকে ক্যাথোড। এই চক্রে তড়িৎকোষ থাকা সত্ত্বেও তড়িৎপ্রবাহ পাওয়া যাবে না কারণ গোলকের ভিতরে দুই পাতের মধ্যবর্তী জায়গাটা ফাঁক, সেখানে ইলেক্‌ট্রন চলবার উপযুক্ত পথ নেই এবং ইলেক্‌ট্রন তড়িৎকোষের নেগেটিভ দিক থেকে পজ়িটিভে যেতে না পারলে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ হবে না। এখানে তড়িৎকোষের নেগেটিভ দিক থেকে সংবাহক-তারের ভিতর দিয়ে ইলেক্‌ট্রনগুলো সিজিঅম-মাখানো পাত পর্যন্ত এসে আটকে গেল। নদীর উপরে পারাপারের সেতু না থাকলে পারে এসেই যাত্রীর যাত্রা শেষ হবে। কিন্তু গরজ যার বেশি সে যাত্রী সাঁতার কেটেও নদী পার হতে পারে। এই রকম যোগাযোগ করে নিয়ে সিজিঅম-পাতে আলো ফেললে ইলেক্‌ট্রনেরা ক্যাথোড ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে এবং তখন অকূলে ভাসবে। এপার থেকে অ্যানোড করবে আকর্ষণ সেই টানে ইলেক্‌ট্রনেরা এসে অ্যানোডে যুক্ত হবে এবং এমনি করে তড়িৎকোষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ইলেক্‌ট্রন চলতে পারবে। এই কথাটাকেই ভাষান্তরিত করে বলা যেতে পারে যে আলোর সাহায্য নিয়ে এ রকম চক্রে

তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা চলবে। আলোকরশ্মির তীব্রতা বাড়লে ইলেক্ট্রনেরা বেশি সংখ্যায় বেরিয়ে আসবে বলে তড়িৎপ্রবাহের বেগও বাড়বে। এই যন্ত্রদ্বারা আলোককে তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তর করা সম্ভব এবং এরই সাহায্যে এক স্থানের আলোর তীব্রতার স্বরূপ এবং তারতম্য তড়িৎপ্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধির আকারে অন্যত্র জানিয়ে দেওয়া চলবে। এই যন্ত্রেরই নাম আলোকোষ। আধুনিক আলোকোষে ক্যাথোড দেওয়া হয় অর্ধ-বেলনাকৃতি (half cylindrical) এবং অ্যানোডের কাজ করে খাড়া একটি তার।

চিত্র ২ — আলো-তড়িৎকোষ
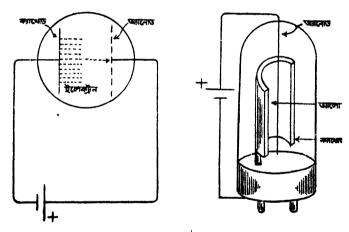
আলোর বৈদ্যুতিক প্রতিলিপি তৈরি করে দেওয়াই আলোকোষের কার্য। আবার এর বিপরীত কাজও করা যেতে পারে, যথা—তড়িতের প্রভাবে আলো উৎপন্ন ক'রে তড়িতের হ্রাসবৃদ্ধিকে আলোর ঔজ্জ্বল্যের তারতম্যে রূপায়িত করা। পূর্বোক্ত কাঁচ-গোলককে নলের আকারে নিয়ে এবং সেটাকে পুরোপুরি বায়ুশূন্য না করে যদি ভিতরে সামান্য বায়ু রেখে দেওয়া যায় এবং অ্যানোড-ক্যাথোড বিশেষরূপে তৈরি না করে

কেবল সাধারণ ছুটি ধাতব পাত মাত্র লাগিয়ে দেওয়া হয়, তবে আবার অন্য রকম ব্যাপার ঘটতে পারে। বাতাসের ভিতর দিয়ে সাধারণত ইলেকট্রন তথা তড়িৎপ্রবাহ চলে না, কিন্তু এখানে যে রকম ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেখানে খুব কম চাপের বাতাস রেখে তড়িৎকোষের সংখ্যা বেশি করে ইলেকট্রন চাপ— বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে ভোল্ট-বিভব— বাড়াতে থাকলে দেখা যাবে একদা বাতাসের ভিতর দিয়েও তড়িৎপ্রবাহ চলবে এবং তারই সঙ্গে নলের ভিতর থেকে উজ্জ্বল আলোক নির্গত হবে। বায়ুর পরিবর্তে অন্য কোনো গ্যাস সামান্য পরিমাণে নলে ভরতি করে দিলে ঐ আলোর রং রকমারি হবে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই রকম ব্যবস্থায় নিওন-গ্যাসের ভিতর দিয়ে স্বল্পায়াসেই, অর্থাৎ ভোল্ট-বিভব অপেক্ষাকৃত কম রাখলেও, প্রবাহ চালু হয়। এখানে বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার হবে এই যে বাইরে থেকে নলের ভোল্ট-বিভব সামান্য বাড়িয়ে দিলেই আলোর ঔজ্জ্বল্য বেশ বৃদ্ধি পাবে। এমনই নিওন-প্রদীপের মধ্যবর্তিতায় তড়িৎপ্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধিকে আলোর তীব্রতার তারতম্যে পরিবর্তিত করা চলবে। বস্তুত আলোকোষ যে কার্য করে থাকে নিওন-প্রদীপ করে তার বিপরীত কার্য। আলো ও তড়িৎশক্তির একটিকে অন্যটিতে রূপান্তরিত করা চলবে এই দুই যন্ত্রের সাহায্যে।

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে নিওন-নলের সম্বন্ধে আরও কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে, যা আলোচ্য বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক হলেও জ্ঞাতব্য হিসাবে উপেক্ষণীয় হবে না। কলকাতা বা অন্য বড় শহরের রাস্তায় অনেক দোকানে হোটেলে বা রেস্তোরাঁয় আলোর অক্ষরে লেখা বিচিত্র বিজ্ঞাপনীগুলো এমনই নিওন বা অন্য কোনো গ্যাসভরা নল। কাঁচের নলকে ইচ্ছামত বাঁকিয়ে যে-কোনো অক্ষরের আকার দেওয়া হয় এবং তাকে রুচি অনুযায়ী গ্যাস ভরতি করে এই কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

বেতারে আলোকচিত্র

অনুভূতির দিক দিয়ে বিচার করলে চক্ষু ও কর্ণের কার্যকারিতায় খানিকটা মৌলিক বৈষম্য ধরা পড়বে। শব্দের তরঙ্গ বায়ুবাহিত হয়ে কর্ণপটহকে কাঁপায়, সে কাঁপুনি থেকেই মস্তিষ্ক পায় শব্দের অনুভূতি। সমগ্র কর্ণপটহ এক কালে একইভাবে কাঁপে। আলোর অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ঈথর-তরঙ্গ অক্ষিপটে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তার অভিব্যক্তি অক্ষিপটের সর্বত্র অভিন্ন নয়, কারণ স্থান বিভেদে আলোর ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণের পার্থক্য থেকেই গড়ে উঠবে একটা দৃশ্যের স্বরূপ। সুতরাং অক্ষিপট একই সময়ে দৃশ্যের বিভিন্ন অংশের আলোর প্রকৃতি পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি করে— কর্ণপটহ এক কালে গ্রহণ করে এক বা বহু শব্দের সমগ্র বা সমষ্টিগত প্রতিক্রিয়া। বাণীর ব্যাপ্তি শুধু কালকে অবলম্বন করে, কিন্তু রূপের প্রকাশে স্থানই মুখ্য। তবে রূপ যদি বদলায় তবে কাল সেখানে অংশ গ্রহণ করবে। সহজ ভাষায় বলব, দৃশ্য স্থান জুড়ে থাকে, তার বিভিন্ন অংশে আলোছায়ার বৈশিষ্ট্য থাকবে। দূরে পাঠাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো দৃশ্যের আলোককে তড়িৎপ্রবাহের সঙ্গে জড়িত করতে চাইলে তার প্রত্যেক অংশকে এক কালে অথচ পৃথক করে বিচার করতে হবে।

একখানা ফোটোর নেগেটিভ-প্লেট আলোর দিকে ধরলে দেখা যাবে যে তার সব জায়গা থেকে সমান আলো বের হয়ে আসে না। নেগেটিভখানা শাদা-কালোয় আঁকা একখানা ছবি— যার সব জায়গায় সমান কালো নয়। যে জায়গাটা স্বচ্ছ সে পথ দিয়ে আলো পুরোপুরি বেরিয়ে আসবে, যেখানটায় কালিমা লেগেছে সেখান দিয়ে আলোর নির্গমন ব্যাহত হবে। ফোটো তোলা ব্যাপারের সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে কাগজে ছবি ছেপে নেবার জন্য নেগেটিভখানা কাগজের উপরে চেপে দিয়ে সামনে থেকে আলো ফেলা হয়। প্লেটের যে জায়গা দিয়ে যে পরিমাণ আলো নির্গলিত হয়ে কাগজে পড়বে সেই অনুযায়ী কাগজ রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে কমবেশি কালো হয়ে ছবিতে রূপান্তরিত হবে।

তাড়িত শক্তিকে কি ব্যবস্থায় তারে বা বেতারে এক জায়গা থেকে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে আমরা এখানে সে আলোচনা করব না।[১] আলোককে কি করে তড়িতের স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া যাবে এখানে আমাদের আলোচনায় গণ্ডি সেই পর্যন্ত নির্দিষ্ট হবে।

কোনো ফোটোকে তড়িতের মধ্যবর্তিতায় দূরে পাঠাতে হলে সেই ফোটোর একখানা নেগেটিভ ফিল্‌ম নিতে হবে। চোঙ-আকৃতি বা ঘুড়ির লাটাইয়ের মতন চেহারাওয়ালা স্বচ্ছ একটা আধারের গায়ে এই
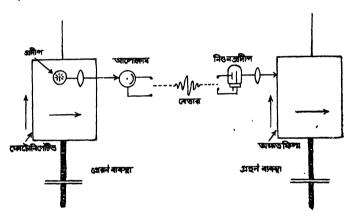
চিত্র ৩ — বেতারে ফোটো প্রেরণ ও গ্রহণ

ফিল্‌মটাকে মুড়ে দিতে হয়। চোঙের ভিতরে মধ্যরেখার উপরে থাকবে একটি স্থির আলো, লেন্সের সাহায্যে যাকে কেন্দ্রীভূত করা চলবে চোঙের বহিঃস্থিত একটা আলোকোষে। চোঙটিকে স্বীয় মধ্যরেখার চারদিকে ঘুরাবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ঘুরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ওটা স্বীয় দৈর্ঘ্যের বরাবর সামান্য সরে যেতে থাকবে। স্ক্রু-কাটা হাতল দিয়ে ঘুরাবার কৌশল করলে চোঙের এমনই দুমুখো গতি দেওয়া সম্ভব। সকলেই

১ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের ৩৫ সংখ্যক গ্রন্থ ডক্টর শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর প্রণীত 'বেতার' পুস্তকে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে

জানেন, একটা স্ক্রু যখন কাঠের গায়ে বসে তখন সে ঘুরবার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েও যায়। চোঙের ভিতরকার আলো ও লেন্স বাইরে থেকে ব্যবস্থা করে আটকানো, চোঙের ভিতরে অবস্থান করলেও এ ক্রুটোর সঙ্গে চোঙের কোনো সংস্পর্শ নেই। তারই ফলে চোঙ ঘুরে ঘুরে এগিয়ে যেতে থাকলে আলো ও লেন্স এক জায়গাতেই স্থির থাকবে এবং প্রারম্ভে আলোটি চোঙের মুখে থাকলে হাতল ঘুরাবার সঙ্গে ওটা চোঙের ভিতরের দিকে আসবে, তাই আলোক-রশ্মি একটু একটু করে ঘূর্ণমান ফিল্‌মের বিভিন্ন বিন্দুতে স্পর্শ বুলিয়ে যেতে থাকবে। ফিল্‌ম ভেদ করে আলোক-রশ্মি এসে পড়বে পূর্বোক্ত আলোকোষের উপর। চোঙটি আগাগোড়া ঘুরিয়ে আনলে ফিল্‌মের প্রত্যেকটি বিন্দু পৃথক্‌ভাবে আলোর সম্মুখীন হবে এবং আলোকোষ উৎপন্ন তড়িৎপ্রবাহে লেখা থাকবে ফিল্‌মের স্বচ্ছতার দাক্ষিণ্যে নির্গলিত আলোর তীব্রতার ধারাবাহিক ইতিহাস। অথবা আলোকরশ্মি যখন ফিল্‌মের যে জায়গা ভেদ করে আসবে তারই কালিমায় প্রাচুর্যের যথাযথ চিহ্ন এঁকে দেবে আলোকোষে আপতিত আলোর দৈন্যে। আলোকোষে এই প্রকারে যে তড়িৎপ্রবাহের উদ্ভব হবে, তাকে যথাসম্ভব বর্ধিত করে তারে কিংবা বেতারে যে-কোনো স্থানে পাঠানো চলবে। প্রেরকযন্ত্রের বিবরণ থেকে এবার চিত্রগ্রহণের কৌশলের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

আলো সহজে প্রবেশ করতে পারে না, এমনি একটা আবরণের ভিতর পূর্ব-বর্ণিত চোঙের মতো আর একটি চোঙ আটকানো আছে। চোঙের গায়ে জড়ানো রয়েছে একটি অক্ষত ফোটো-ফিল্‌ম অর্থাৎ যেটা ইতিপূর্বে আলোর স্পর্শ পায়নি। বহিরাবরণের এক প্রান্তে একটি ছোটো ফুটো রয়েছে যে-পথে পূর্ব-অধ্যায়ে বর্ণিত একটি নিওন-প্রদীপের আলো লেন্সের সাহায্যে পথ করে নিতে পারে ফিল্‌মের দেহে ছাপ রেখে যাবার জন্য। যে তড়িৎপ্রবাহ প্রেরকযন্ত্রের সংলগ্ন ফোটো-ফিল্‌মের উপরকার কালিমাবিন্যাসের তালিকা বহন করে আনছে তাকে ধরে নিয়ে লাগাতে হবে এই নিওন-প্রদীপে কমবেশি আলো উৎপন্ন করতে। তাহলেই নিওন-প্রদীপের আলো পলকে পলকে জানিয়ে দেবে প্রেরিত

চিত্রের শাদা-কালো সমাবেশের নির্ভুল খবর। নিওন-প্রদীপের আলোর রশ্মি আবরণের রন্ধ্রপথে স্পর্শ করবে ফিল্মকে। এখানকার চোঙটি প্রেরকযন্ত্রের চোঙের সঙ্গে সমগতিতে ঘুরাতে থাকলে ফিল্মের উপর আঁকা হয়ে যাবে প্রেরকযন্ত্রের ফোটো-নেগেটিভের বিভিন্ন অংশ দিয়ে নির্গলিত আলোর ছাপ। চোঙটি ঘুরিয়ে সবটুকু ফিল্মে এমনই ছাপ এঁকে নিলে পাওয়া যাবে মূল ফিল্মের প্রতিলিপি। তড়িৎদূত মুহূর্তমধ্যে এমনই করে নিয়ে আসবে এক দেশের ছবি অন্য দেশে।

নিওন-প্রদীপ ব্যবহার না করে অন্যরকম ব্যবস্থাদ্বারা ফোটোনেগেটিভ তৈরির পরিবর্তে সোজাসুজি কাগজের উপরে কালি দিয়ে ছবি এঁকে নেওয়া চলতে পারে। খবরের কাগজে যে রকম ফুট্‌কিওয়ালা ছবি দেখতে পাওয়া যায় তেমনই ছোটো ছোটো বিন্দু দিয়ে গড়া ছবিই এই ব্যবস্থায় তৈরি করা যাবে। এই রকম বেতারে ছবি ছাপার কার্যকে আরও সম্প্রসারিত করে বেতার-সংবাদপত্র চালু করবার সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে। খবরের কাগজ পাবার জন্য ভোরবেলা ফেরিওয়ালার অপেক্ষায় থাকতে হবে না। রাতে ঘুমের অবসরে নিজস্ব বেতারযন্ত্রের মধ্যেই ছাপা হয়ে থাকবে গোটা একখানা খবরের কাগজ, সচিত্র ও বিচিত্র।

বেতারে আলোকচিত্র প্রেরণের এই পদ্ধতি অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে চিত্র পাঠাতে হলে তার বিভিন্ন অংশকে পৃথকভাবে নিতে হবে, সমগ্র চিত্র এক সঙ্গে পাঠানো চলবে না। দৃশ্য বা চিত্রকে এমনই টুকরো টুকরো করে বিচার করবার ইংরেজি নাম স্ক্যানিং (scanning), বাংলায় অনুবাদ করলে কথাটার অর্থ দাঁড়াবে পরম্পরীণ-দৃষ্টিনিক্ষেপ। যে সজ্জার কথা বলা হল তাতে কেবল ফোটো-নেগিটিভের সাহায্যেই কোনো ছবিকে পাঠানো চলবে। আরও একটু জটিল ব্যবস্থা করে নিলে কাগজে-আঁকা ছবিও পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু কোনো রকমেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে একটা দৃশ্য বা ঘটনার ছবি সরাসরি পাঠানো চলবে না। সে রকম কার্যে সাফল্য লাভ করবার জন্য পরম্পরীণ-দৃষ্টিনিক্ষেপ-ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে নিতে হয়েছে। পরবর্তী নিবন্ধে তার পরিচয় দেওয়া গেল

বেঅর্ড-পদ্ধতি

দৃশ্যমান কোনো বস্তুর স্বরূপ দূরবর্তী দর্শককে জানিয়ে দেবার জন্য বস্তুটির উপরে প্রথমে আলো ফেলতে হবে। আপতিত আলোর যতটুকু যে স্থান থেকে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল তাকে ধরে নিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারলেই দূরেক্ষণ (television) সম্ভব হবে। ছবিই হোক আর তার আসল মূর্তিই হোক তাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেক অংশের আলো থেকে পৃথক তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করতে হবে। দৃশ্যের বিভিন্ন অংশের এরূপ পরম্পরীণ বা ধারাবাহিক বিচার করবার ব্যবস্থার মূলনীতি সহজবোধ্য হবে যদি আমরা যে পদ্ধতিতে বই পড়ি সে কথা ভেবে দেখি। বইয়ের পাতায় যা লেখা থাকে তা আমরা এক সঙ্গে সবটুকু পড়তে পারি না। এক প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে এক-একটি অক্ষর ও শব্দের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, এক অক্ষর দেখে নিয়ে পরের অক্ষরে লক্ষ্য করি। এক শব্দ থেকে পরবর্তী শব্দে এক লাইন পড়া শেষ হলে পরবর্তী লাইনে দৃষ্টি নামিয়ে আনি, আবার গোড়া থেকে শুরু করে যাই লাইনের শেষে। প্রকৃতপক্ষে গোটা পৃষ্ঠাখানা এইরূপে টুকরো টুকরো করেই চোখের সম্মুখে ধরা হয়ে থাকে। বিভিন্ন অংশকে পর পর দৃষ্টির গোচরীভূত করবার জন্য কোনো দৃশ্য কিংবা চিত্রকে এমনই ব্যবস্থা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নিতে হবে, এইরূপ ভাগ করাকে আমরা বলব ব্যবচ্ছেদ।

এখানে একটা সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রাখা ভাল। বইয়ের পাতার শব্দাবলী একটার পর একটাই পড়ে যাওয়া দরকার, নতুবা অর্থবোধ হয় না। কিন্তু কোনো মানুষ কিংবা তার ছবিকে দেখবার বেলায় যদি ঐ রকম টুকরো টুকরো করে দেখি তবে কি করে তার রূপ সম্বন্ধে ধারণা হবে? কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে কোনো-কিছুর উপর থেকে যে আলোক-রশ্মি বিক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে আসে তার গোটা প্যাটার্নটাই লক্ষ্যবস্তুর স্বরূপের পরিচয় দেয়। সুতরাং চোখে দেখবার সময় লক্ষ্যবস্তুকে কেটে কেটে দেখলে সত্যিকার অনুভূতি হবে কেন?

প্রশ্নটি খুবই উপযুক্ত। কিন্তু একটা গোটা দৃশ্যকে ভাগে ভাগে দেখলেও দর্শনানুভূতির দিক দিয়ে কিছু অসুবিধা হবে না, যদি আমরা সবগুলি টুকরো এক সেকেণ্ডের এক-দশমাংশ সময়ের অবসরে দেখে নিতে পারি। কোনো-কিছু দেখবার পরও উল্লিখিত সময় পর্যন্ত মস্তিষ্কে তার অনুভূতি থেকে যায় অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তু দৃষ্টির অন্তরালে যাবার পরেও ঐ কালটুকু তাকে দেখতে পাওয়া যাবে এবং এইজন্য এক-দশমাংশ সেকেণ্ডের মধ্যে দৃষ্ট সবগুলি ব্যাপারই একটা গোটা দৃশ্য বলে মনে হবে, ওদের পৃথক বলে ধরা যাবে না। সুতোর আগায় বাঁধা একটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গকে সুতো ধরে বেগে ঘুরালে একরত্তি স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করবে একটি আলোর মালা। মস্তিষ্কের এইরকম জড়তা আছে বলেই সিনেমার জড় ছবিগুলি জীবন্ত মনে হয়। দূরদর্শন কার্যে প্রেরকযন্ত্রের অন্যতম ও প্রাথমিক কার্য হবে দৃশ্যের ব্যবচ্ছেদ এবং তৎপর প্রত্যেক অংশ থেকে আলো গ্রহণ করে তাকে তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তর করা। চিত্র বা দৃশ্যকে এইভাবে ভাগ করে নেবার জন্য যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

গোল একটা ধাতব চাকতি নিয়ে তার ভিতরে কতকগুলি একই আকারের ও সমদূরবর্তী ছোটো ছোটো ফুটো করে নিতে হবে। ফুটোগুলো চাকতির প্রান্তভাগে সাজানো থাকবে কিন্তু এগুলোর সজ্জা ঠিক চক্রাকৃতি হবে না, হবে কুণ্ডলিত (spiral), অর্থাৎ পর পর ছিদ্রগুলো ক্রমশ চাকতির কেন্দ্রের দিকে সামান্য অগ্রবর্তী। মনে করতে হবে একটা স্বল্পপরিসর গবাক্ষপথ দিয়ে আলো এসে একটি পর্দায় পড়ছিল— দুয়ের মাঝখানে এই চাকতিটি বসিয়ে দেওয়া হল। গবাক্ষটির আকৃতি এমনই রাখা হয়েছে যাতে কোনো অবস্থাতেই এক কালে একটির বেশি ফুটো গবাক্ষের সামনে থাকবে না। চাকতি ঘুরোলে তৎকালে গবাক্ষের সম্মুখীন ছিদ্রটি গবাক্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সরে আসবে এবং যখন এটি গবাক্ষ ছেড়ে আসবে তখনই পরবর্তী ছিদ্রটি অন্য প্রান্তে প্রবেশ করবে গবাক্ষের সীমানার ভিতরে। গবাক্ষের দৈর্ঘ্য প্রথম ও শেষ ছিদ্রের এবং প্রস্থ পর পর যে-কোনো দুই ছিদ্রের দূরত্বের সমান হলে এমনই যোগাযোগ ঘটতে পারে।

গবাক্ষ দিয়ে আলো যে পর্দায় পড়ছিল তার দিকে এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক। চাকতিটি না থাকলে পর্দার উপরে গবাক্ষের আকৃতির অনুরূপ একটি আলোর চতুষ্কোণ রচিত হত কিন্তু চাকতির জন্য প্রায় সবটুকু আলোই আটকে যাবে, মাত্র একটি ছিদ্রপথে সামান্য আলো নির্গত হয়ে পর্দার উপরে কোনো স্থানে বিন্দুর আকারে পড়বে। এখন চাকতি ঘূর্ণমান হলে যে ছিদ্র দিয়ে আলো বেরিয়ে আসছিল সেটি এক পার্শ্বে সরে আসবার জন্য আলোবিন্দু পর্দার গায়ে একটি আলোর রেখা টেনে যাবে। তারপর একটু পরেই ঐ ছিদ্র দিয়ে আর আলো বের হবে না, কারণ সে তখন গবাক্ষের বাইরে চলে গেছে। তখন আলো নির্গলিত হবে তার পরবর্তী ছিদ্রপথে। কিন্তু এই ছিদ্রটি কেন্দ্রের দিকে

চিত্র ৪ — সছিদ্র চাকতিদ্বারা চিত্রব্যবচ্ছেদ

অগ্রসর ব'লে একটু নীচে অবস্থিত, তাই এবারকার রেখাটি হবে আগেকার রেখার ঠিক নীচে। এমনি করে চাকতি ঘুরাবার সঙ্গে সঙ্গে আলোর রেখাটি ক্রমে নীচে নেমে আসবে। একবার ঘুরানো হয়ে গেলে আলো আবার প্রথম রেখায় চলে আসবে। চাকতিখানা খুব বেগে ঘুরানো হলে তখন পৃথক রেখাগুলিকে আর পৃথক বলে মনে হবে না, পর্দার উপরে পূর্বে উল্লিখিত আলোর চতুষ্কোণই গঠিত হবে ; যদিও এই আলোর চতুষ্কোণে স্থূল দৃষ্টিতে আলোর কোনো তারতম্য বোঝা যাবে

চিত্র ৫ — আলোকবিন্দুদ্বারা পরম্পরাগত বিচার
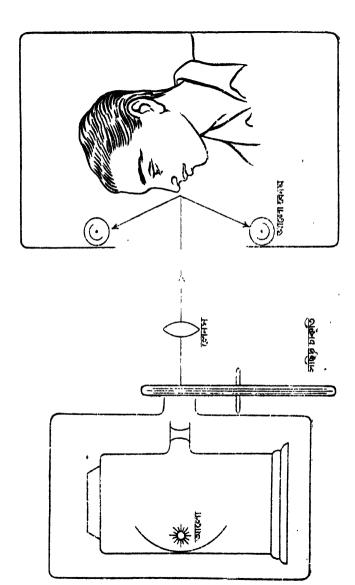
না। কিন্তু একথা সত্য, চতুষ্কোণটি কার্যত গঠিত হবে অনেকগুলি আলোকবিন্দুদ্বারা যারা একটার পর একটা পর্দার উপরে পড়ছে এবং এককালে একটির বেশি দুটো বিন্দু কখনোই পর্দার উপরে থাকছে না। এই বিন্দুসম্পাতের সময়ের ব্যবধান আমাদের অনুভূতির বাইরে চলে গিয়ে থাকলেও ওদের সত্যকার অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলবে না।

মনে করা যাক, অন্ধকার ঘরে এক ব্যক্তি বসে আছেন। ঘরের বাইরে একটা প্রকোষ্ঠে রয়েছে একটা উজ্জ্বল আলোর উৎস, সেখান থেকে একটিমাত্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়ে আলো বেরিয়ে উক্ত ব্যক্তির দেহের উপরে পড়তে পারে। এই গবাক্ষের সামনে রয়েছে পূর্ব-বর্ণিত চাকতিখানা। চাকতির ছিদ্র দিয়ে একবিন্দু আলো পড়েছে মানুষের দেহে, চাকতি ঘুরাবার সঙ্গে আলোকবিন্দু দেহের উপর দিয়ে এক স্থান থেকে সরে অন্যত্র যাচ্ছে। চাকতির ঘূর্ণনবেগ বাড়ালে সাধারণ দৃষ্টিতে অবশ্য ব্যক্তিটির সর্বত্রই আলো পড়েছে বলে মনে হবে। অন্ধকার ঘরের এক পার্শ্বে রয়েছে সুবিধামতো জায়গায় এক বা একাধিক আলোকোষ। আলোচ্য ব্যক্তির দেহের যে বিন্দু থেকে যখন আলো ঠিকরে আসছে, আলোকোষে সেই অনুযায়ী তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হচ্ছে; দেহ থেকে বিক্ষিপ্ত বিন্দু বিন্দু আলো প্রতিক্ষণে আলোকোষে পৌঁছবে এবং সে আলোর ঔজ্জ্বল্য অনুসারে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হবে। বিভিন্ন সময়ে দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে কমবেশি আলো ঠিকরে আসবে এবং বৈদ্যুতিক অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত হবে। এই পরিবর্তনশীল তড়িৎপ্রবাহ তারে বা বেতারে যথা ইচ্ছা পাঠানো যেতে পারে। এই রকম কৌশলে দৃশ্যকে ব্যবচ্ছেদ করবার নাম দেওয়া হয়েছে আলোকবিন্দু দ্বারা পরম্পরীণ বিচার (spotlight scanning)। আলোকোষ ও আলোর উৎস একে অন্যের স্থান-বিনিময় করে নিলেও মূল ব্যাপারের কিছুই রদবদল হবে না তবে তখন মানুষটি বরাবরই উজ্জ্বল আলোকে থাকবেন। তেমনি করে দৃশ্যকে বিচার করবার পদ্ধতিও সমভাবে কার্যকরী।

এবারে চিত্রগ্রাহকযন্ত্রের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রেরক-যন্ত্র থেকে যে তড়িৎপ্রবাহ তারে বা বেতারে পাঠানো হবে তাকে

প্রথম গ্রাহকযন্ত্রে ধরে নিয়ে যথাসম্ভব বিবর্ধন করবার পর প্রবাহকে পাঠিয়ে দিতে হবে একটি নিওন-প্রদীপের ভিতরে, যাতে এই পরিবর্তনশীল তড়িৎপ্রবাহ রূপান্তরিত হবে এমন আলোতে যার ঔজ্জ্বল্য কমছে বাড়ছে। নিওন-প্রদীপ থেকে বেরিয়ে আলো পড়বে আর একটা সছিদ্র চাকতির সামনে। এই চাকতিখানা সর্বভাবে প্রেরকযন্ত্রের চাকতি থেকে অভিন্ন। এমন কি, এদের ঘূর্ণনবেগও নিখুঁতভাবে সমান রাখতে হবে। দুটো চাকতি ঘুরবে ঠিক একই অবস্থাতে, প্রেরকযন্ত্রের যে-ছিদ্রটি আলোচ্য ব্যক্তির দেহের যে অংশে থাকবে গ্রাহকযন্ত্রের চাকতিও তার সম্মুখীন পর্দার অনুরূপ অংশে অবস্থিত হবে। এ রকম করে দুটো চাকতিকে একই অবস্থায় ঘূর্ণমান করবার একটা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা আছে, যার বাংলা প্রতিশব্দ দাঁড়াবে— সমলয়করণ (synchronise)।

চাকতির ফুটো দিয়ে বেরিয়ে নিওন-প্রদীপের রশ্মি বিন্দু বিন্দু করে পড়বে একটা পর্দার উপরে। চাকতিটি ঘূর্ণমান বলে পর্দায় আপতিত
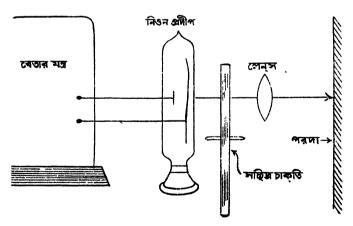
চিত্র ৬ — নিওনপ্রদীপের সাহায্যে চিত্র নির্মাণ

আলোকবিন্দু স্থানপরিবর্তন করবে। আগত তড়িৎ-সংকেতের তীব্রতার তারতম্যের জন্য সব আলোকবিন্দু সমান উজ্জ্বল হবে না, তাই বিভিন্ন

স্থানে আপতিত আলোকের তীব্রতার তারতম্য থাকবে। বিভিন্ন জায়গার আলোর বিন্যাসকে একত্র গ্রথিত করে নিলেই চিত্র পাওয়া যাবে। পর্দার বিভিন্ন স্থানে আলোকবিন্দু একই সময়ে পড়বে না সত্য, কিন্তু ওরা এত দ্রুত এসে পড়বে যে, ওদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না। পর্দার সব আলোকবিন্দু সমগ্রভাবে একটা গোটা ছবিই ফুটিয়ে তুলবে। পর পর বিন্দুগুলো কি রকম সময়ের ব্যবধানে পর্দায় আসবে সেটার ধারণা করা চলবে যদি বলি এমন একটা চাকতিতে ত্রিশটি ছিদ্র থাকতে পারে এবং সেটাকে প্রতি সেকেণ্ডে একশ পঁচিশ বার ঘুরানো হয়ে থাকে।

সমলয় করবার ব্যাপারে সামান্য ত্রুটি ঘটলে পর্দায় যে ছবি ফুটে উঠবে তা অনেক সময়ে হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে। কখনও-বা ছবি উল্টো হবে, কখনও-বা কেটে দু'খণ্ড হবে, হয়ত-বা তার এক অংশ সোজা, অপরাংশ উল্টো। দুটো যন্ত্রকে সমলয় করবার জন্য স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা করা চলবে, যাতে অনভিজ্ঞের হাতে পড়েও যন্ত্র অচল হবে না।

বেতারের সাহায্যে চোখের দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করবার এই পদ্ধতির সঙ্গে আবিষ্কর্তা বেঅর্ডের নাম বিজড়িত রয়েছে।

বেঅর্ড-পদ্ধতির কতকগুলি ত্রুটি ও অসুবিধা আছে। বিশেষভাবে-সজ্জিত কক্ষ ভিন্ন এই পদ্ধতি অন্যত্র প্রযোজ্য নয়। বস্তু বা ছবির যথাযথ প্রতিলিপি পেতে হলে পরম্পরীণ বিচারব্যবস্থা খুব সূক্ষ্ম হওয়া প্রয়োজন। চাকতিদ্বারা ব্যবচ্ছেদ করে নিয়ে বিচার করবার পদ্ধতি এ-হিসেবে খুব কার্যকরী বলা চলে না। এ রকম ত্রুটি দূর করবার জন্য আধুনিককালে আরও নতুন কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। তত্ত্ব ও কার্যপ্রণালী উভয় দিক থেকেই এ সব ব্যবস্থা বেঅর্ড-পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। ইলেকট্রনকে অবলম্বন করে বিজ্ঞানের যে নতুন শাখা গড়ে উঠেছে, নতুন পদ্ধতি তাকেই ভিত্তি করে পরিকল্পিত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই ইলেকট্রন-তত্ত্বের আলোচনা করছি।

ক্যাথোড-রশ্মি ও ফোটো-ক্যাথোড

বায়ুশূন্য একটি কাঁচগোলকের অভ্যন্তরে তড়িৎপ্রবাহ চালাবার কথা বলা হয়েছিল। সে প্রসঙ্গেরই আবার অবতারণা করতে হবে। লম্বা একটি কাঁচের নলের দুদিকে দুটো ধাতব পাত জুড়ে দিতে হবে এবং তারপর নলটা বায়ুশূন্য করে পাতদুটোর সঙ্গে তড়িৎকোষের সংযোগ করে দিলে তড়িৎপ্রবাহ চলবে না, এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যদি তড়িৎকোষের সংখ্যা— কার্যত তড়িতের চাপ বা ভোল্ট-বিভব— বাড়ানো হয় তবে এমন অবস্থা আসবে যখন তড়িৎকোষের নেগেটিভপ্রান্ত যেখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেই পাত— অর্থাৎ ক্যাথোড— থেকে অজস্র ইলেকট্রন বেরিয়ে নলের ভিতর দিয়ে স্রোতের আকারে চলতে থাকবে অ্যানোডের দিকে। অ্যানোড তড়িৎকোষের পজিটিভ-প্রান্তের সঙ্গে সংলগ্ন বলে ইলেক্‌ট্রন ঐ দিকে আকৃষ্ট হয়ে সামনে ছুটবে। আবিষ্কারের সময় এই ইলেক্‌ট্রন-স্রোতকে আলোর রশ্মি বলে ভুল করা হয়েছিল, তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছিল ক্যাথোড-রশ্মি। পরে অবশ্য এদের স্বরূপ জানা গিয়েছিল। এই ক্যাথোড-রশ্মির কতকগুলো বিশেষ গুণ ও ধর্ম রয়েছে, তারা আমাদের বতমান প্রসঙ্গে কাজে লাগবে।

ক্যাথোড-রশ্মির ইলেক্‌ট্রনগুলো প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে এবং নলের প্রান্তে ভোল্ট-বিভব বৃদ্ধি ক'রে বা অন্য উপায়ে এদের বেগ ইচ্ছামতো বাড়িয়ে দেওয়া চলতে পারে।

ক্যাথোড-রশ্মি বাধাপ্রাপ্ত হলে বিশেষ বিশেষ পদার্থের উপর আলোক উৎপন্ন করে। এই আলোর উৎপত্তির কারণকে বলা হয় প্রতিপ্রভা (flourescence)। ক্যাথোড-রশ্মির তীব্রতা বাড়লে উৎপন্ন আলোকের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। ক্যাথোড-রশ্মি ক্যাথোড থেকে বেরিয়ে সরলরেখায় চলবে। কিন্তু এদের চুম্বক কিংবা তড়িতের প্রভাবে ইচ্ছামতো বাঁকানো যাবে। চুম্বক বা তড়িতের প্রভাব যত বাড়বে, রশ্মি তত বেশি নুইয়ে পড়বে।

ক্যাথোড-কণিকারা ইলেক্‌ট্রন ছাড়া আর কিছু নয় ব'লে এরা যে দর্শনের গণ্ডি অনেক বেড়েছে এবং বিজ্ঞানের এই বিভাগে বিস্ময়কর

বস্তুকে স্পর্শ ক'রে যাবে সে বস্তুকে নেগেটিভ-তড়িৎগ্রস্ত করবে, আবার যদি কোনো পজ়িটিভ-তড়িৎগ্রস্ত বস্তুতে লাগে তবে তার তড়িতাধান কমিয়ে দেবে। এখানে একথা আবারও উল্লেখ করা ভাল যে, কোনো পদার্থের পরমাণু থেকে ইলেক্‌ট্রন বেরিয়ে গেলে পদার্থটি পজ়িটিভ-তড়িৎগ্রস্ত এবং কোনো পরমাণুতে বাইরের ইলেকট্রন সংযুক্ত হলে সেটা নেগেটিভ-তড়িৎগ্রস্ত হয়ে থাকে। ইলেক্‌ট্রন যত বেশি বেরিয়ে যাবে বা মুক্ত হবে, তড়িতাধান তত বেশি হয়েছে বলা হবে।

ক্যাথোড-রশ্মি উৎপন্ন করবার জন্য অ্যানোডের ভোল্ট বিভব বৃদ্ধি করার প্রয়োজন, সেকথা বলা হয়েছে। কিন্তু ভোল্ট-বিভব খুব বেশি না বাড়িয়ে অন্য প্রকারেও ক্যাথোড-রশ্মি পাওয়া যেতে পারে। তাপ দিলে কোনো কোনো পদার্থ থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। ক্যাথোড-রশ্মি-নলে ক্যাথোডের জন্য ধাতব পাত ব্যবহার না ক'রে যদি ওখানে শুধু একটা তার বসিয়ে ঐ তারকে উত্তপ্ত করা যায়, তবে তার থেকে তাপপ্রভাবে মুক্ত ইলেক্‌ট্রনেরাও অ্যানোড কর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে ক্যাথোড-রশ্মির মতোই ব্যবহার করবে। এই তার-নির্মিত ক্যাথোডকে তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যেই উত্তপ্ত করা চলবে।

একস্থানের দৃশ্যের স্বরূপ অন্যত্র উদ্ভাসিত করতে হলে যে প্রক্রিয়াগুলো করতে হবে তাকে মোটামুটি তিন পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে: ১. আলোককে তড়িতে রূপান্তর, ২. তড়িৎপ্রবাহকে আলোতে পরিবর্তন, ৩. দৃশ্যকে ব্যবচ্ছেদ করে পরম্পরীণ বিচার-ব্যবস্থা।

পূর্বে বর্ণিত বেঅর্ড-পদ্ধতিতে যথাক্রমে আলোককোষ, নিওন-প্রদীপ ও সছিদ্র চাকতি এই তিনটি যন্ত্রের সাহায্যে এই তিন কার্য করা হত। কেবল ক্যাথোড-রশ্মিকে ব্যবহার করেই এই কাজগুলো কি করে করা যাবে তাই হবে পরবর্তী আলোচ্য বিষয়।

এতৎসম্পর্কিত ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগাবার জন্য বেগপ্রাপ্ত ইলেক্‌ট্রনকে দরকার হবে। তাই কার্যকরী ক্যাথোড-রশ্মি-নলের আকৃতি ও সজ্জা পরিবর্তন ক'রে নিতে হয়েছে। অ্যানোড-রূপে ব্যবহৃত পাতটিতে থাকবে সূক্ষ্ম একটা ছিদ্র যার ভিতর দিয়ে ক্যাথোড-রশ্মি

বেগযুক্ত হবার পরে সরু স্রোতে বেরিয়ে আসতে পারবে। এই জাতীয় নলে অ্যানোডের পরেও নলের ভিতরে আরও খানিকটা জায়গা থাকবে যেখানে ক্যাথোড-রশ্মি প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করা চলবে। প্রয়োজন ভেদে নলের চেহারায় আরও নানা রকমারি ব্যবস্থা করতে হবে।

ক্যাথোড-রশ্মি চুম্বকের প্রভাবে বেঁকে যায়, একথা বলা হয়েছে। সাধারণ্যে পরিচিত চৌম্বকদণ্ড ছাড়া অন্য ব্যবস্থা দ্বারাও চুম্বকের অনুরূপ প্রভাব সৃষ্টি করা চলতে পারে। কোনো তারের কুণ্ডলী দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চলতে থাকলে সে কুণ্ডলী সর্বতোভাবে চুম্বকের ন্যায় কাজ করে, উপরন্তু তড়িৎপ্রবাহের শক্তি বাড়িয়ে এর চুম্বকত্ব ইচ্ছামত বাড়ানো যায়। তড়িৎপ্রবাহের শক্তি দ্রুত পরিবর্তন করতে পারলে চুম্বকেরও অনুরূপ দ্রুত পরিবর্তন ঘটবে। ক্যাথোড-রশ্মিকে বিচলিত করবার জন্য এই প্রকার তড়িৎপ্রবাহ-সম্বলিত কুণ্ডলীর ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় এমন প্রয়োজন হতে পারে যাতে ক্যাথোড-রশ্মিকে ক্রমে বেশি বাঁকিয়ে নিতে হবে এবং তারপর খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে তাকে আবার সহসা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে দেওয়া হবে। এই কায করবার জন্য তড়িৎকুণ্ডলীতে এমন প্রবাহ ব্যবহার করা হবে যার শক্তি শূন্যমান থেকে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে একটা চরম মান পর্যন্ত উঠবার পর আপনি আবার অকস্মাৎ চরম থেকে একেবারে শূন্যতে নেমে আসে, এবং তারপর পুনরায় পূর্বের মত বাড়তে থাকে। তড়িৎপ্রবাহের এই রকম পরিবর্তনকার্য খুব সহজে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় সম্পন্ন করা যায়। এতদ্ব্যতীত দুটো আড়াআড়ি চুম্বকের প্রভাব একই সঙ্গে প্রয়োগ করে ক্যাথোড-রশ্মিকে যুগপৎ দুই দিকে বা প্রয়োজনমতো যে-কোনো দিকে গতিশীল করাও চলবে। ক্যাথোড-রশ্মির এই গুণকে অবলম্বন করে দৃশ্যের পরম্পরীণ বিচারকার্য খুব সহজ ও সুষ্ঠু হবে, যেটা সছিদ্র চাকতিতে সম্ভব হয় নি।

ক্যাথোড-রশ্মি বিশেষভাবে তৈরি পর্দায় পড়লে সেখানে আলোর উৎপত্তি হবে এ-কথার উল্লেখ করা হয়েছে। ক্যাথোড-রশ্মিতে ইলেকট্রনের বেগ ও সংখ্যা যত বেশি হবে, উৎপন্ন আলোর ঔজ্জ্বল্য

তত বাড়বে। ইলেকট্রনের বেগ ও সংখ্যা কমে গেলে ঔজ্জ্বল্যও কমবে। ইলেকট্রনের বেগ বাড়াবার জন্য অ্যানোডের ভোল্ট-বিভব বাড়ানো যেতে পারে। এ ছাড়া ইলেকট্রনের সংখ্যা সামান্য কমিয়ে-বাড়িয়ে উৎপন্ন আলোকের তীব্রতার ইতরবিশেষ করবার জন্য আরও একটা ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ক্যাথোডের তারকে ঘিরে একটা চোঙের মতন আচ্ছাদন লাগিয়ে দেওয়া হয়, তার নামকরণ হয়েছে শীল্ড (shield)। এই রকম আচ্ছাদন লাগিয়ে ক্যাথোডের অনুপাতে তার ভোল্ট-বিভব কিছু কম রেখে দিলে ক্যাথোড-রশ্মির তীব্রতা বাড়ে। ক্যাথোড-রশ্মিকে যখন পর্দায় আলোক উৎপন্ন করতে নিয়োজিত করা হবে, তখন শীল্ডে খুব সামান্য বৈদ্যুতিক পরিবর্তন সাধন করলেই পর্দার আলোকের ঔজ্জ্বল্য কমবে বাড়বে। এইভাবে শীল্ডের তাড়িত-পরিবর্তনকে ক্যাথোড-পর্দায় আলোর হ্রাসবৃদ্ধিতে রূপান্তরিত করা চলবে। যে তড়িৎসংকেত রেঅর্ড-পদ্ধতিতে নিওন-প্রদীপকে সক্রিয় করেছিল, তাকে ক্যাথোড-নলের শীল্ডে যুক্ত করলে ক্যাথোড-রশ্মি নিওন-প্রদীপের চেয়ে ভাল কাজ করবে।

আধুনিক একটি ক্যাথোড-রশ্মি-নলের সজ্জা ১০ম চিত্রে দেখানো হলো। এই নলের গোড়ার দিকটা খানিকটা লম্বা নল আর সম্মুখের অংশ শঙ্কু (cone) আকৃতি। নলের প্রান্তে রয়েছে তারে-তৈয়ারী ক্যাথোড, ক্যাথোডের উপরে আচ্ছাদন (shield)। খানিকটা দূরে সরন্ধ্র অ্যানোড। অ্যানোডের পরে ক্যাথোড-রশ্মিকে বিচলিত করবার ব্যবস্থা অর্থাৎ কয়েকটি তারের কুণ্ডলী, তার ভিতরে ইচ্ছামতো তড়িৎপ্রবাহ চালানো যাবে। নলের শেষপ্রান্তে শঙ্কুর তলাকার অংশে কাঁচের দেওয়ালে রাসায়নিক পদার্থ— জিঙ্ক সিলিকেট— মাখানো থাকে যাতে ক্যাথোড-রশ্মি এখানে এসে আলো উৎপন্ন করতে পারে। এটার নাম ক্যাথোড-রশ্মি-পর্দা।

আলোককে তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করবার জন্য ক্যাথোড-রশ্মির সঙ্গে আরও একটি যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। এই বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে তাড়িতশাস্ত্রের অবতারণা করবার প্রয়োজন আছে।

তড়িতের অভিব্যক্তি দুই প্রকার— পরিভাষায় বলে চলবিদ্যুৎ ও স্থিরবিদ্যুৎ। কোনো বস্তুর পরমাণু থেকে ইলেক্ট্রন মুক্ত হলে বস্তুটি পজিটিভ-তড়িৎগ্রস্ত হয়ে পড়বে একথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। পরমাণুতে ইলেক্ট্রন-আধিক্যের নাম নেগেটিভ-তড়িতাধান, কমতি হলে আধান পজিটিভ। আবার দুটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুকে সংবাহক-তার দিয়ে সংযোগ করে দিলে যেটাতে ইলেক্ট্রনের চাহিদা থাকবে তারই ঘাটতি পুরন করতে ইলেক্ট্রন একটি থেকে অপরটিতে যাবে যাতে দুটোর ইলেক্ট্রন-ক্ষুধার সাম্য স্থাপিত হয়। এখানে বলে রাখা সংগত যে, ইলেক্ট্রনের চাহিদা কোন্‌টাতে বেশি হবে তা কেবল ইলেক্ট্রনের আপেক্ষিক সংখ্যাল্পতা দিয়ে নির্ণীত হবে না; বস্তুটির আকৃতি ও গঠন তথা তড়িতাধানের পরিমাণ, এরাই নিরুপণ করবে পারস্পরিক ইলেকট্রনের চাহিদা। এই চাহিদাকেই প্রকারান্তরে বলা হয় ভোল্ট-বিভব। এই রকম কারণে দুটো তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর ভিতরে যখন ইলেকট্রন-বিনিময় হয়ে থাকে তা থেকেই তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি। চলবিদ্যুৎ ও স্থিরবিদ্যুতের ব্যাপারগুলো একই সত্য থেকে উদ্ভূত। এ দুটোর একটি কার্য, অপরটি কারণ।

পক্ষান্তরে একটা তড়িৎগ্রস্ত ও অন্তরিত (insulated— অপরের সঙ্গে যার বৈদ্যুতিক সংযোগ নাই) ধাতব পাতের সামনে অপর একখানা ধাতব পাত স্থাপনা করলে, এই শেষোক্ত পাতে প্রথম পাতের বিপরীত জাতের তড়িৎ সঞ্চারিত হতে দেখা যাবে। এ ক্ষেত্রে পাতদুটোতে কোনো সংযোগব্যবস্থা না থাকলেই এই ব্যাপার ঘটবে। এই রকম সজ্জা করে দুটো পাত রাখলে যে যন্ত্র তৈয়ারী হবে তার নাম কণ্ডেন্‌সর (condenser)। শেষোক্ত পাতে তড়িৎ সঞ্চারের কারণ অপর তড়িৎগ্রস্ত-পাতের নৈকট্য ও প্রভাব, এর বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা আবেশ (induction)। তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর সংস্পর্শে আনলে অন্য কোনো বস্তু ঐ তড়িতাধানের খানিকটা অংশ গ্রহণ করে ও নিজে তড়িৎগ্রস্ত হয়ে থাকে; সংস্পর্শ না ঘটিয়ে শুধু সান্নিধ্যদ্বারাও কোনো বস্তুতে তড়িৎ সঞ্চার সম্ভব। তবে সান্নিধ্যে তড়িৎসম্পদ হবে ভিন্ন অর্থাৎ বিষম জাতের

কিন্তু সমানুপাতিক। এই রকম সান্নিধ্যের গুণে কোনো বস্তুকে তড়িৎগ্রস্ত করার ব্যাপারকেই আবেশ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আবেশের হেতুকে লোপ করে দিলে আবেশও নিঃশেষিত হবে, যেমন পূর্বোক্ত কণ্ডেন্‌সরে যদি মূল তড়িতগ্রস্ত পাতের তড়িতাধান নষ্ট হয়ে যায় তবে অপর পাতের তড়িৎসংস্থানও বিলুপ্ত হবে। আবেশের বিলুপ্তি থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থাদ্বারা তড়িৎপ্রবাহও পাওয়া যেতে পারে। যথাস্থানে আমরা তার বর্ণনা দেব।

তড়িৎ-বহন-করে-না এমন কোনো পদার্থ দুটো ধাতব পাতের মাঝখানে বসিয়ে দিলেই কণ্ডেন্‌সর তৈরি হয়। অভ্র তড়িৎ বহন করে না। এক খণ্ড অভ্রের উপর সিলভার-অক্সাইড লাগিয়ে তাতে উত্তাপ দিলে সিলভার-অক্সাইড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিলভার অর্থাৎ রজতগুটিকায় পরিণত হবে। বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকটি গুটিকাকে পার্শ্ববর্তী অন্য গুটিকা থেকে অন্তরিত করে নেওয়া যায়। তারপর সকল রজত-গুটিকার উপরে সিজিঅম-অক্সাইডের প্রলেপ দিতে হবে। অভ্রখণ্ডের একটা দিকে এমনি সজ্জা করে নিয়ে অপর দিকটায় আর একটি ধাতব পাত লাগিয়ে দিলে কার্যত কণ্ডেন্‌সর তৈরি হবে; তবে কণ্ডেন্‌সর একটি নয়, অসংখ্য। কারণ প্রত্যেকটি গুটিকাই এক-একটি ক্ষুদে কণ্ডেন্‌সর, যদিও পেছনের পাতখানা সকলেরই যৌথ সম্পত্তি।

এখন মনে করতে পারি এই কণ্ডেন্‌সরের রজত-পৃষ্ঠে আলো পড়ছে। আলো পড়বার জন্য সিজিঅম থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে আসবে এবং তারই ফলে প্রত্যেকটি রজতগুটিকা পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত হয়ে পড়বে। যদি সব যায়গায় আপতিত আলোর তীব্রতা সমান না হয় তবে সব গুটিকার তড়িতাধান সমান হবে না। পেছনের পাতে আবেশের ফলে সকল গুটিকার তড়িতাধানের সমষ্টির সমপরিমাণ নেগেটিভ-তড়িৎসঞ্চার হবে। অতঃপর একটি একটি করে ক্ষুদে কণ্ডেন্‌সরের তড়িতাধান লোপ করে দিতে পারলে পেছনের পাতের তড়িতাধানও একটু একটু কমতে থাকবে, কিন্তু যদি সব গুটিকার তড়িতাধান সমান না হয়, তবে পেছনের পাতের তড়িতাধানের বিলুপ্তি

প্রত্যেকবার সমপরিমাণ হবে না। পেছনের পাতখানাকে অন্য কোনো তড়িৎচক্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে রেখে দিলে এই তড়িতাধান বিলুপ্তির ফলে সে চক্রের তড়িৎপ্রবাহের তারতম্য হতে পারে।

মূলত এখানে আলোর প্রভাব থেকেই তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হবে। ক্যাথোড-রশ্মি-নলে এমনি একটা কণ্ডেন্সর বসিয়ে দিয়ে
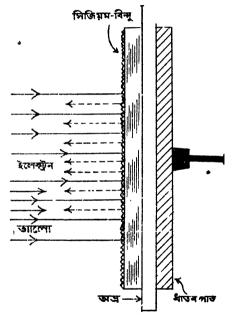
চিত্র ৭ — ফোটো-ক্যাথোড

আলোর প্রভাবে ও ক্যাথোড-রশ্মির সাহায্যে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। তাই এই রকম করে তৈরি কণ্ডেন্সরের নাম দেওয়া হয়েছে ফোটো-ক্যাথেড।

ক্যাথোড-রশ্মি ও ফোটো-ক্যাথোড এই দুটির প্রয়োগের কথা বললেই আধুনিক দূরেক্ষণযন্ত্রের কার্যপ্রণালী জানা যাবে।

প্রেরকযন্ত্র

দূরেক্ষণকে (Television) কার্যকরী রূপ দেবার জন্য আমেরিকার বিজ্ঞানী জোরিকিন আইকনোস্কোপ (Iconoscope) বা এমিট্রন ক্যামেরা নির্মাণ করেছেন। কার্যপ্রণালী বিচার করলে দেখা যাবে

চিত্র ৮— আইকনোস্কোপ
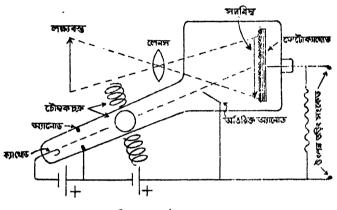
চক্ষু ও ফোটো-ক্যামেরার সঙ্গে এই যন্ত্রের চমৎকার সাদৃশ্য আছে। ক্যাথোড-রশ্মি-নলের গঠন ও আকৃতি একটু বদলিয়ে নিয়ে এতে ব্যবহার করা হয়েছে। নলের গোড়ার দিকটা বর্ণিত ক্যাথোড-রশ্মি-নলের মতই— ক্যাথোড, অ্যানোড, চৌম্বকচক্র সবই রয়েছে; তাছাড়াও আছে একটা অতিরিক্ত অ্যানোড এবং নলের শেষ দিকটা চতুষ্কোণ। এই চতুষ্কোণের পেছনকার দেয়ালের কাছে মাঝামাঝি জায়গায় বসানো থাকবে একটা ফোটো-ক্যাথোড। বাইরে রয়েছে একটা লেন্স এবং এরই কার্যকারিতায় দৃশ্য বা লক্ষ্য বস্তুর একটা আলোছায়ায় গড়া প্রতিকৃতি বা সদ্‌বিম্ব চকিতে একবার এসে পড়বে ফোটো-ক্যাথোডের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে ফোটো-ক্যাথোডের রজতগুটিকা তথা সিজিঅম-বিন্দু থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে সামনে ছুটবে সেই অ্যানোডের আকর্ষণে, যেটা অতিরিক্ত আখ্যা দিয়ে বসানো হয়েছে নলের মাঝামাঝি যায়গায়।

এই অ্যানোডের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে ফোটো-ক্যাথোডের পেছনকার ধাতব-পাতের এবং এখানে এই সংযোগ দ্বারা একটা তড়িৎচক্র তৈরি করে রাখা হল যাতে অনুকূল অবস্থায় তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হবে। ফোটো-ক্যাথোডের যেখানে যে প্রকার আলো এসে পড়েছিল তারই নির্দেশে রজতগুটিকা কমবেশি তড়িৎগ্রস্ত হয়ে রইল এবং এরই ফলে পেছনের পাতে তড়িৎসঞ্চার হল। চক্ষুর লেন্স যেমন করে অক্ষিপটের বিভিন্ন জায়গায় কমবেশি উজ্জ্বল আলো আনয়ন করে, অথবা ফোটো-ক্যামেরার লেন্স ফোটো-প্লেটে যেমন আলোক-সম্পাত করে, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল। অক্ষিপটে আপতিত আলো উত্তেজিত করে নার্ভকে, ফোটো-প্লেটের আলো ক্রিয়া করে রাসায়নিক পদার্থের উপর, ফোটো-ক্যাথোডের আলো থেকে তড়িতাধান সঞ্চারিত হল অগণিত কণেগুন্সরে; অতঃপর দূরে পাঠিয়ে দেবার জন্য তাকে পর পর রূপান্তরিত করে নিতে হবে তড়িৎপ্রবাহে।

নলের মূল-ক্যাথোড-রশ্মির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে ঐ রশ্মি বেরিয়ে সোজা ফোটো-ক্যাথোডের উপরে পড়বে। ক্রমবর্ধমান চৌম্বক শক্তির দ্বারা একে ফোটো-ক্যাথোডের শীর্ষ থেকে পাদমূল পর্যন্ত একটা সরল রেখায় টেনে নেওয়া যাবে। ক্যাথোড-রশ্মিকে খুব সূক্ষ্ম করে নিতে হবে, যাতে এককালে সে দু'একটির বেশি রজতগুটিকাকে স্পর্শ না করে। যে গুটিকা ক্যাথোড-রশ্মির স্পর্শ পেল, অমনি শেষ হয়ে গেল তার তড়িৎসম্পদ, কারণ ক্যাথোড-রশ্মি এর গায়ে ইলেকট্রন লাগিয়ে দেবে। একদা আলোর প্রভাবে যে ইলেকট্রন হারিয়ে এর তড়িৎসম্পদ জুটেছিল সেই ইলেকট্রন ফিরে পাবার ফলে সে তড়িৎ নিঃশেষিত হল। এর জন্য ফোটো-ক্যাথোডের পেছনকার পাতে আবিষ্ট তড়িৎসংস্থানও খানিকটা কমে যাবে এবং তাতে পাতসংলগ্ন পূর্বোক্ত সংবহনচক্রে একটু ক্ষীণ তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হবে। ক্যাথোড-রশ্মি যখন যে গুটিকার উপরে এসে পৌঁছবে তখন তার তড়িতাধানানুযায়ী উৎপন্ন প্রবাহ কম বা বেশি হবে। এমনি করে একটির পর একটি রজতগুটিকার তড়িতাধান লোপ করে দিয়ে

ক্যাথোড-রশ্মি নেমে আসবে ফোটো-ক্যাথোডের পাদমূলে, সেখান থেকে আবার সোজা ফিরে যাবে শীর্ষদেশে। এই ফিরতি পথে ক্যাথোড-রশ্মি কোনো তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করবে না, কারণ ইতিপূর্বে যে সকল গুটিকার তড়িৎসম্পদ লোপ করে দিয়েছে এখন সেগুলোর উপর দিয়েই চলবে। শীর্ষদেশে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় আর একটি চৌম্বক শক্তির প্রভাবে ক্যাথোড-রশ্মি একপার্শ্বে একটু সরে আসবে। ততক্ষণ প্রথম চুম্বকের শক্তি আবার বাড়তে আরম্ভ করেছে এবং সে আবার ক্যাথোড-রশ্মিকে আগেকার মত নিয়ে যাবে পাদমূলে। এমনি করে ক্যাথোড-রশ্মি পাশাপাশি একটার পর একটা সরল রেখা আঁকতে আঁকতে সমগ্র ফোটো-ক্যাথোড পরিভ্রমণ করবার পর আবার ফিরে আসবে আদি বিন্দুতে যেখানে হয়েছিল ওর যাত্রা শুরু। কিন্তু এই ফিরে আসবার অবসরে ক্যামেরার লেন্সের পথে প্রবেশ করে নতুন আর এক ঝলক আলো পরবর্তী দৃশ্যের বৈদ্যুতিক ছাপ এঁকে দিয়েছে ফোটো-ক্যাথোডের অগণিত রজতগুটিকায়।

লেন্সের কার্যকারিতায় দৃশ্যের সদ্‌বিম্ব ফোটো-ক্যাথোডে পড়লে রজতগুটিকার গায়ে তার বৈদ্যুতিক প্রতিলিপি অঙ্কিত হবে। ক্যাথোড-রশ্মিকে ক্রমবর্ধমান চৌম্বক শক্তি দ্বারা ভ্রাম্যমাণ ক'রে আলোর বৈদ্যুতিক লিপিকে টুকরো টুকরো করে তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তর করবার পর বেতারে দূরে পাঠান চলবে। ভ্রাম্যমাণ ক্যাথোড-রশ্মিই এখানে দৃশ্যকে ব্যবচ্ছেদ করছে। যত বেশি সংখ্যক ভাগে ব্যবচ্ছেদ করা হবে ছবি তত স্পষ্ট ও সুন্দর হবে। ক্যাথোড-রশ্মি যত বেশি সূক্ষ্ম হবে, এ কার্য তদনুযায়ী নিখুঁত হবে। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্যাথোড-রশ্মিকে এত সূক্ষ্ম করে নেওয়া চলবে যাতে সমগ্র ফোটো-ক্যাথোডের এলাকাটা পরিভ্রমণ করতে ক্যাথোড-রশ্মির চার থেকে পাঁচ শত বার ওঠা-নামা করতে হবে অর্থাৎ ফোটো-ক্যাথোডকে এইভাবে চার পাঁচ শত রেখায় ভাগ করে নেওয়া চলবে— এক-একটি সরল রেখা আবার অনুরূপ সংখ্যক বিন্দুতে তৈরি। সহজ করে বলতে পারি যে, ফোটো-ক্যাথোডে যে ছবিটি পড়ে, তাকে মোটামুটি দুই লক্ষ বিন্দুতে ভাগ করা হয়ে থাকে এবং

এরই প্রত্যেক বিন্দু থেকে আলো তথা তড়িৎসংকেত পর পর পৃথকভাবে প্রেরণ করা হয়। ক্যাথোড-রশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে পঁচিশ-ত্রিশবার ফোটো-ক্যাথোডকে পরিভ্রমণ করে। এর অর্থ এই হবে, যে কোনো চলন্ত দৃশ্যের পঁচিশ ত্রিশখানা ছবি প্রতি সেকেণ্ডে তুলে নেওয়া হচ্ছে।

কার্যত প্রতি সেকেণ্ডে মোটামুটি হিসাবে (২০০০০০ × ৩০ =) ষাট লক্ষ তড়িৎসংকেত উৎপন্ন হতে থাকবে। এই তড়িতপ্রবাহকে বেতার-তরঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। যে প্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে ষাট লক্ষ বার কমছে বাড়ছে, তাকে যথাযথ বহন করে নেবার জন্য এর চেয়েও দ্রুতপরিবর্তনশীল প্রবাহ প্রয়োজন হবে এবং এ কারণে ছোটো বেতারতরঙ্গের আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আপাতত থাক।

জোরিকিনের এমিট্রন-ক্যামেরার মতই আরও একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন ফার্নসওআর্থ। তাঁর যন্ত্রের নাম ডিসেক্টর টিউব (Dissector Tube) বা অর্থিকনোস্কোপ (Orthiconoscope)। জোরিকেনের যন্ত্রের সঙ্গে এর কার্যপ্রণালীর বিশেষ প্রভেদ না থাকলেও এর গঠনরীতি অন্য রকম। যদি এমিট্রন-ক্যামেরাকে মূলত ক্যাথোড-রশ্মি-নল বলা চলে, সেদিক দিয়ে অর্থিকনোস্কোপকেও বলা যাবে পরিবর্তিত আলোকোষ।

পূর্ব-বর্ণিত আলোকোষের সিজিঅম-মাখানো ক্যাথোডের পরিবর্তে সেখানে বসিয়ে দিতে হবে একটি ফোটো-ক্যাথোড। জালের আকারে যে অ্যানোড ছিল তারই জায়গায় থাকবে মাত্র একটি সরু তারের অগ্রভাগ। এমিট্রন-ক্যামেরার মতোই এতেও লেন্সের প্রভাবে ফোটো-ক্যাথোডে পড়বে দৃশ্যবস্তুর আলোছায়ার প্রতিলিপি এবং তারই ফলে ফোটো-ক্যাথোডের বিভিন্ন বিন্দু থেকে কমবেশি ইলেক্ট্রন বেরিয়ে সামনে চলতে থাকবে। সাধারণত ফোটো-ক্যাথোড থেকে নির্গত ইলেক্ট্রন সোজা সামনে চলবে, এমন ব্যবস্থা করা থাকবে; এবং এই রকম পরিস্থিতিতে কেবল মধ্যবিন্দু থেকে যে-ইলেক্ট্রন বের হবে সেই স্পর্শ করতে পারবে অ্যানোডকে এবং তারই খেয়ালখুশিতে তড়িৎ-প্রবাহ চলবে। এখন চুম্বকের প্রভাবে একে একে এবং পর পর সব

বিন্দুর ইলেকট্রন-রশ্মিকেই অ্যানোডে পৌছিয়ে দেওয়া চলবে। যখন যে বিন্দুর রশ্মি অ্যানোড স্পর্শ করবে তখন তদনুযায়ী তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হবে। সুতরাং উৎপন্ন তড়িৎপ্রবাহে লেখা থাকবে দৃশ্যের বিভিন্ন জায়গা হতে বিক্ষিপ্ত আলোর স্বরূপ। তাই সংশ্লিষ্ট চক্রে যে প্রবাহ চলবে,

চিত্র ৯ — অর্থিকনোস্কোপ
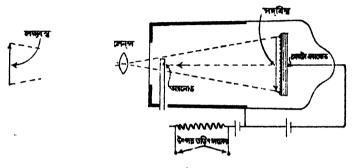
সেটা একটানা স্থির প্রবাহ হবে না, কখনো সামান্য বাড়বে, কখনো বা একটু কমবে। এই হ্রাসবৃদ্ধির মধ্যেই লুকিয়ে থাককে আলোর বিন্যাস।

তড়িতের অভিব্যক্তি থেকে আবার আলোর ছাপ তুলে নিলে দৃশ্য ফুটে উঠবে চোখের সামনে— সে কাজ করবে গ্রাহকযন্ত্র।

গ্রাহকযন্ত্র

চিত্র গ্রহণ করবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার কার্য-প্রণালীতে জটিলতা কম। প্রেরিত দৃশ্যের আলোর স্বরূপ নিয়ে আসছে যে তড়িৎপ্রবাহ, তাকে ধরে নিয়ে প্রয়োজনমতো বিবর্ধনের পর ব্যবহার করা হবে একটি ক্যাথোড-রশ্মি-নলে, যার এক প্রান্তে ক্যাথোড-রশ্মিকে আলোতে রূপান্তরিত করবার উপযুক্ত পর্দা আছে। রশ্মিকে পর্দার উপর দিয়ে ভ্রাম্যমাণ করবার জন্য শক্তিশালী এবং ক্রমবর্ধমান চুম্বকশক্তি উৎপন্ন করা হবে। শীল্ডের তড়িৎ-বিভবের পরিবর্তন করে ক্যাথোড-রশ্মির তীব্রতা, তথা পর্দায় উৎপন্ন আলোকের ঔজ্জ্বল্য কমানো বা বাড়ানো চলবে। স্বাভাবিক অবস্থাতে
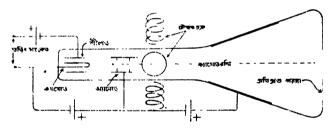
চিত্র ১০ — ক্যাথোড-রশ্মি নলে চিত্রনির্মাণ

ক্যাথোড-রশ্মির তীব্রতা এমন রাখতে হবে যাতে পর্দায় বিশেষ উজ্জ্বল আলোর উৎপত্তি হবে না। প্রেরকযন্ত্র থেকে আলোর প্রতিলিপি নিয়ে আসছে যে তড়িৎসংকেত, তাকে ধরে নিয়ে সংযোগ করে দেওয়া হবে শীল্ডে। এই তড়িৎসংকেতের ক্রিয়ায় ক্যাথোড-রশ্মির তীব্রতা বাড়বে কমবে— সঙ্গে সঙ্গে তারতম্য ঘটবে পর্দার আলোর ঔজ্জ্বল্যে। প্রতিক্ষণে ক্যাথোড-রশ্মি বিন্দু বিন্দু আলোক উৎপন্ন করবে, সে আলোককে পর্দার উপর পর পর সাজিয়ে যেতে হবে। ক্যাথোড-রশ্মিকে ক্রমে সরিয়ে নিয়ে এ কাজ করা চলবে। প্রেরকযন্ত্রের সঙ্গে

সমলয় করে গ্রাহকযন্ত্রের ক্যাথোড-রশ্মিকে চালাতে হবে এবং তাহলেই যথাযথ ছবি ফুটবে পর্দার গায়ে।

সাধারণ প্রচলিত গ্রাহকযন্ত্রে ছবির আকৃতি ১০×১২ ইঞ্চি বা তার কাছাকাছি মাপের হয়ে থাকে। আরও বড় ছবি পেতে হলে ক্যাথোড-রশ্মি-নলের আকার বড় করা প্রয়োজন। কিন্তু নল বড় করবার অন্য রকম অসুবিধাও আছে। আকারে বড় করলে বায়ুশূন্য নল বাইরের বাতাসের বর্ধিত চাপে ভেঙে যেতে পারে। বেতারের ছবি সিনেমা-পর্দায় দেখাবার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে; এখনো এটা ঠিক কার্যকরী অবস্থায় আসে নি, ভবিষ্যতে যে আসবে তাতে সন্দেহ নেই। এইসব প্রচেষ্টার উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক্যাথোড-রশ্মি-পর্দায় যে ছবি পাওয়া যায় তার ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে সোজাসুজি সিনেমা-প্রজেক্টরের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এ কাজে ছবিকে যতটা উজ্জ্বল করতে হবে, তার জন্য অ্যানোডের ভোল্ট-বিভব ষাট সত্তর হাজারের কম হলে চলবে না। এত বেশি ভোল্ট-বিভব সৃষ্টি করা ও তা নিয়ে কাজ করা কোনোটাই খুব সহজ ও নিরাপদ হবে না।

আরও একটা ব্যবস্থা নিয়ে চেষ্টা চলছে— এটা অনেকাংশে কার্যকরী। বেতারে প্রাপ্ত তড়িৎসংকেতকে আলোতে রূপান্তরিত করবার পর সে আলোকে নিয়োগ করা হবে ফোটো-ফিল্ম তৈরি করতে। আলোর ছাপ অর্থাৎ চিত্র গ্রহণ করবার পর ফিল্ম যাবে রাসায়নিক দ্রবের (developer) ভিতরে— সেখানে ওর গায়ে শাদা-কালোয় ছবি ফুটে উঠবে। এই ছবি সেখান থেকে যাবে সিনেমার প্রজেক্টরে এবং পর্দায় বৃহদাকারে আত্মপ্রকাশ করবে। ছবি প্রদর্শিত হবার পর এটার আর প্রয়োজন নেই, তখন একে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে। পুনরায় নতুন ফোটো নেবার পক্ষে উপযুক্ত করবার জন্য এতে রাসায়নিক পদার্থ লাগিয়ে এবং একে শুকিয়ে আবার আলোর সম্মুখীন করা হবে। মালার মত প্রান্তহীন এক খণ্ড ফিল্ম এমনি করে ঘুরে ঘুরে আসবে এবং এর ভিতরে একটার পর

চিত্র ১১ — আকাশ-তার থেকে সিনেমা-পর্দায়
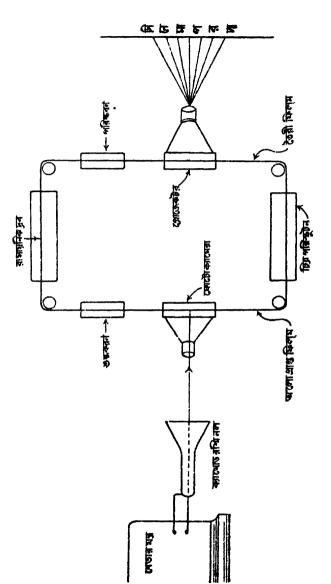
একটা ছবি উঠবে। ফিল্মকে আলোর সংস্পর্শে আনবার দু মিনিটের মধ্যে ছবি পর্দায় দেখান চলবে এবং একই সময়ে ফিল্মের কোনো অংশ প্রজেক্টরে রয়েছে, কোনো অংশ আলোর সম্মুখীন হয়েছে, কোনো অংশে হয়ত রাসায়নিক পদার্থ মাখানো হচ্ছে— ফিল্মখানা ক্রমাগত ঘুরে যাচ্ছে, এখান থেকে সেখানে।

কোনো দৃশ্যকে স্বাভাবিক বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত অবস্থায় পর্দায় উপস্থিত করবার চেষ্টাও এখন কার্যকরী হয়েছে। প্রেরকযন্ত্রের আলো লেন্সে ঢুকবার আগে তাকে তিনবার তিন রঙের— সবুজ আসমানি ও লাল— তিনটি কাঁচের ছাকনির (filter) ভিতর দিয়ে পাঠানো হয়। কাঁচ-তিনখানা লাগানো থাকে একটা ঘূর্ণমান চাকার ভিতরে। এই কৌশল করে আলো আসতে দিলে একই দৃশ্যের তিন রকম ছবি তৈরি হবে। গ্রাহকযন্ত্রের পর্দার সামনেও অনুরূপ তিনটি ছাকনি ব্যবহৃত হবে এবং প্রেরকের সঙ্গে সমলয়ে চলবে। তিন রঙের তিনখানা ছবি পর পর দ্রুত আবির্ভূত হবে বলে তাদের পার্থক্য ধরা যাবে না এবং সমগ্র ছবিটি রঙিন হয়ে উঠবে।

একটা দৃশ্যের চিত্র একাধিক ক্যামেরায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে গ্রহণ করে পৃথকভাবে পাঠানো যেতে পারে। প্রেরিত বিভিন্ন চিত্র পৃথক পৃথক গ্রাহক-নলে ধরে নিতে হবে ; তবে সবগুলি নলের আলোই একই সময়ে একই পর্দার উপরে পড়বে, কিন্তু বিভিন্ন অবস্থান থেকে। এই রকম কৌশল করবার জন্য গ্রাহকযন্ত্রের ক্যাথোড-রশ্মি-নল বিশেষভাবে তৈরি করে নিতে হবে। এই পদ্ধতি দ্বারা যে ছবি পাওয়া যাবে তা ত্রৈমাত্রিক হবে অর্থাৎ তাকে সাধারণ ছবির মত চ্যাপ্টা মনে হবে না, বাস্তব জিনিষের রূপ নিয়ে ছবি ফুটে উঠবে পর্দার গায়ে।

বেতার-তরঙ্গে আলো ও শব্দ

কোনো দৃশ্য বা চিত্রের প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশ থেকে আলো গ্রহণ করে তাকে তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তর করাই হচ্ছে বেতারে চিত্র প্রেরণের মূল কথা। চিত্র গ্রহণ করবার সময় যদি ফোটাগ্রাফির সাহায্য নেওয়া হয় অর্থাৎ ছবিটি সরাসরি চোখ দিয়ে না দেখে ফোটোর একটা নেগেটিভ প্রথমে তৈরি করবার যদি ব্যবস্থা থাকে, তবে বিভিন্ন অংশের আলো কতটা সময় পরে পরে এল তাতে কিছু ইতরবিশেষ হবে না, একমাত্র এই কার্যের জন্য সময় কিছু বেশি লাগা ছাড়া। কিন্তু যদি চিত্রকে সঙ্গে সঙ্গে চোখে দেখবার জন্য পর্দায় ফেলা হয় তবে গোটা চিত্রটি এক সেকেণ্ডের পঁচিশ ত্রিশ ভাগ সময়ের ভিতরেই দেখিয়ে দিতে হবে। এই কার্য করতে গেলে নিখুঁত ছবি দেখাবার জন্য প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ষাট লক্ষ বিন্দু থেকে আলো গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক বিন্দুর আলো স্বীয় ঔজ্জ্বল্যের অনুপাতে একটা ক্ষীণ তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করবে। কাজেই সংকেতবাহী তড়িৎপ্রবাহ সেকেণ্ডে ষাট লক্ষ বার কমবে বাড়বে। এই হ্রাসবৃদ্ধিকে আরোপ করবার জন্য একটা শক্তিশালী তড়িৎপ্রবাহ ব্যবহার করতে হবে। বেতারের কৌশল নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করব না বলেছি, তবে এ কথাটা উল্লেখ করতে হবে যে বেতারের জন্য দ্রুতপরিবর্তনশীল তড়িৎপ্রবাহ দরকার হয়ে থাকে। যে শক্তিশালী তড়িৎপ্রবাহের উপর আরোপ করে বার্তা বা আলোর সংকেতকে বেতারে পাঠানো হয় সেটা কী গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে সেই ব্যাপারটাই প্রকাশ করা হয় বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য উল্লেখ ক'রে। যে প্রবাহ যত দ্রুত বদলায় তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য তত কম। তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যত ছোটো হবে, বেতারের কার্য তত ভাল হবে— এটা অনেক কারণে স্বীকার করতে হয়েছে।

আলোর সংকেতকে এমন বেতারপ্রবাহের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে যার পরিবর্তনের হার প্রতি সেকেণ্ডে ষাট লক্ষের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি। দশ মিটারের চেয়ে বেশি দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গ দিয়ে সেজন্য

আলোর সংকেত বহন করানো চলবে না। আধুনিক দূরেক্ষণ বা টেলিভিসন -যন্ত্রে এই কারণে ছোটো বেতার-তরঙ্গ ব্যবহার করতে হবে। তা করতে গিয়ে দেখা গেল আরও নূতন সমস্যা আসছে।

বেতার-তরঙ্গ আলোর তরঙ্গের মতই সরল রেখায় গমন করে বলে পৃথিবীর বাঁকা পৃষ্ঠকে অনুসরণ করে বাঁকা চলবে না, তাই বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীর সমতল দিয়ে বেশি দূরে যেতে পারে না। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এ কথা সত্য হলে নিউইয়র্ক থেকে যে বেতারবার্তা পাঠানো হয় তা ভারতবর্ষে শোনা যায় কী করে— কারণ পৃথিবীর দেহের ভিতর দিয়ে যাওয়া ভিন্ন ঐ তরঙ্গ সরল রেখায় নিউইয়র্ক থেকে ভারতে আসতে পারে না। কিন্তু তবুও ত আসছে! এই ব্যাপারে আরও একটা নৈসর্গিক ব্যাপার বিজ্ঞানীর সহায়তা করেছে। পৃথিবীর উপরে ঊর্ধ্বাকাশে বাতাসের কয়েকটা তড়িৎগ্রস্ত স্তর আছে। প্রশ্ন হতে পারে, এরা তড়িৎগ্রস্ত হবার সুযোগ পেল কোথায়?

আমাদের সৌভাগ্য যে, সূর্যালোকের বেগনি-পারের রশ্মিগুলি (ultra-violet rays) পৃথিবীতে এসে পৌছতে পারে না। ঊর্ধ্বাকাশের বাতাস এদের শোষণ করে নিয়ে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে অনিষ্টকর তড়িৎপ্রভাব থেকে। কিন্তু সমুদ্রমন্থনের বিষ নীলকণ্ঠকে রেহাই দেয় নি। বেগনি-পারের রশ্মির তেজে ঊর্ধ্বাকাশের বাতাস হচ্ছে তড়িৎগ্রস্ত।

পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বে উঠে যায় যে বেতার তরঙ্গ, তড়িৎগ্রস্ত স্তর তাদের অনেককে আটকে দেয়— সেখান থেকে প্রতিহত হয়ে এরা আবার চলে অন্য দিকে, হয়ত বা তারপর আবারও ঐ স্তরে ধাক্কা খায়। এমনি করে যায় এক আকাশ থেকে অন্য আকাশে— বারংবার প্রতিফলিত হবার ফলে আবার ফিরে আসে পৃথিবীতে, নিউইয়র্কের তরঙ্গ পৌছায় নিউদিল্লীতে।

বেতারের দীর্ঘতরঙ্গ বলে অভিহিত অপেক্ষাকৃত বড় ঢেউগুলির এমনি প্রতিফলিত হবার সুযোগ নেই, কারণ তড়িৎগ্রস্ত স্তর পর্যন্ত পৌছবার আগেই তাদের শক্তি বাতাস ভেদ করতেই নিঃশেষ হয়ে

যায়— বলতে পারি, নীচের আকাশের বাতাস ওদের শোষণ করে নেয়। সেজন্য দীর্ঘতরঙ্গগুলির পাল্লা খুব বেশি হয় না এবং এই কারণে বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীর উপরে দূরবর্তী কোনো জায়গায় পাঠাতে হলে ছোটো তরঙ্গেরই ব্যবহার করতে হবে।

কিন্তু বেতারে আলো প্রেরণ করবার জন্য যে-মাপের তরঙ্গ প্রয়োজন বলে বলা হয়েছে সেগুলি আরও ছোটো বলে তারা আবার তড়িৎগ্রস্ত স্তরে বাধাই পায় না এবং তড়িৎগ্রস্ত স্তর ভেদ করে মহাকাশে স্থান করে নেয়। এ কারণে এদেরও প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবার সুযোগ নেই। সুতরাং বেতারে দৃশ্যপ্রেরণ-কার্যের পাল্লা বড় করা সম্ভব হয় নি। যে জায়গা থেকে পাঠানো হবে তার ত্রিশ চল্লিশ মাইলের ভিতরেই গ্রাহকযন্ত্র চালু হবে, তার বেশি দূরে নয়। প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের আকাশ-তারকে (aerial) উঁচু করলে খানিকটা সুবিধা হয়। এই অসুবিধার জন্য অনেক সময়ে আলোকবাহী তড়িৎসংকেতকে সাধারণ টেলিগ্রাফের তারে ইচ্ছামত দূরে নিয়ে যাবার পর সেখান থেকে স্বতন্ত্রভাবে বেতারে ছড়ানো হয়ে থাকে।

কিন্তু কোনো সংকেত হঠাৎ অনেক দূরে পৌঁছবার খবর অনেক সময় পাওয়া গেছে। নিউইয়র্ক থেকে পরিবেশিত এক দৃশ্যের বেতার-সংকেত ছ'শ মাইল দূরবর্তী ইণ্ডিয়ানাপোলিসে পৌঁছেছিল বলে প্রচারিত হয়েছিল। সৌরকলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে তড়িৎগ্রস্ত বায়ুস্তরের স্বরূপ বদলায় এবং তারই ফলে দশ মিটারের চেয়ে ছোটো তরঙ্গও তখন তড়িৎগ্রস্ত স্তর ভেদ করতে অসমর্থ হয়ে ফিরে আসতে পারে। হয়ত এরূপ কারণে কোনো কোনো সময়ে দৃশ্য-সংকেত অনেক দূরে গিয়ে থাকে।

বেতারে রূপ ও বাণী একই তরঙ্গে এক সঙ্গে পাঠানো সম্ভব ছিল না। প্রেরক ও গ্রাহক -যন্ত্রের শব্দেও আলোর জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখতে এবং দুটি পৃথক যন্ত্রই ব্যবহার করতে হয়। এটা অসুবিধার ব্যাপার এবং এতে খরচাও বেশি পড়ে। গ্রাহক ও প্রেরক -যন্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই সরঞ্জাম দ্বিগুণ করতে হয়। কিছুদিন পূর্বে একটা নূতন উদ্ভাবন কার্যের খবর

পাওয়া গেছে যাতে একই যন্ত্রে শব্দ ও আলো দুটোই পাশাপাশি পাঠানো চলবে বলে প্রকাশ। ব্যাপারটি একটু জটিল হলেও এখানে উল্লেখ করা সংগত।

এমিট্রন-ক্যামেরার কার্যপ্রণালী পর্যালোচনা করে ফোটো-ক্যাথোডের শীর্ষ থেকে পাদমূলে পৌছতে ক্যাথোড-রশ্মির কতটা সময় লাগে তা স্থির করা যাবে। প্রতি সেকেণ্ডে ক্যাথোড-রশ্মি ফোটো-ক্যাথোডকে পঁচিশ বার পরিভ্রমণ করলে এবং প্রতি বারে ফোটো-ক্যাথোডকে চারশ রেখায় ভাগ করলে দেখা যাবে রশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে (২৫ × ৪০০ =) দশ হাজার রেখা এঁকে যায়। প্রত্যেকটি রেখা আঁকতে ক্যাথোড-রশ্মির লাগবে এক সেকেণ্ডের দশ-সহস্রাংশ সময়। এরই মধ্যে নয় ভাগ সময় যাবে —গুটিকার তড়িৎ-সংস্থান লোপ করে দিয়ে— শীর্ষ থেকে পাদমূলে যেতে এবং বাকি এক ভাগ সময়ে ক্যাথোড-রশ্মি ফিরে আসবে পরবর্তী রেখার শীর্ষে। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, এই শেষোক্ত সময়টুকু ক্যাথোড-রশ্মি তড়িৎসংবহন-চক্রে কোনো প্রবাহ উৎপন্ন করবে না। অথবা বলতে পারি, এই সময়ে আলোর প্রভাবে কোনো তড়িৎসংকেতের সৃষ্টি হবে না। এই সময়ের ফাঁকেই শব্দের সংকেত ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে বেতার-তরঙ্গের ভিতরে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় যে শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে তার সবটুকু অবশ্য পাঠানো চলবে না— এক সেকেণ্ডে উৎপন্ন সমগ্র ধ্বনি থেকে টুকরো করে করে এক-দশমাংশ মাত্র প্রেরিত হবে। তবে এক সেকেণ্ডে শব্দ গ্রহণ করবার জন্য যন্ত্রে দশ হাজার বার ফুরসৎ পাওয়া যাবে, যদিও প্রতি কিস্তিতে প্রাপ্ত সময়ের পরিমাণ সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। শব্দের অনুভূতি সৃষ্টি করতে এইটুকুই নাকি যথেষ্ট।

এই পরিকল্পনায় এমন গ্রাহকযন্ত্র তৈরি করা হয়েছে যাতে শব্দ ও আলোর জন্য পৃথক চাবি ঘুরাতে হবে না, বা প্রেরণ করবার জন্যও দুটো আলাদা সরঞ্জাম রাখতে হবে না। এই যন্ত্র চালু হলে বেতার-দৃষ্টি আরো সহজলভ্য হবে। যন্ত্র নির্মাণের জটিলতা বৃদ্ধি পেলেও যন্ত্রের ব্যবহার সহজ হবে এবং খরচাও কমবে।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ক্যাথোড-রশ্মি প্রয়োগ করবার পর বেতারের দৃষ্টি স্টুডিও গবেষণাগার ইত্যাদি ছেড়ে খেলার মাঠ জনসভা বিমানঘাঁটি রঙ্গমঞ্চ ও রাজপথে নেমে এসেছে ও বনে-জঙ্গলে রণক্ষেত্রে জলে-স্থলে সর্বত্র প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। সাধারণ ফোটো-ক্যামেরার মতই বেতারের ক্যামেরা অনায়াসে যত্রতত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। আনন্দপরিবেশন ও সচিত্রবার্তা প্রকাশ ছাড়াও টেলিভিসনের অনেক রকম ব্যবহারিক সার্থকতা আবিষ্কৃত হয়েছে। উপসংহারে তারই গোটা কয়েকের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

যুদ্ধক্ষেত্রে এরোপ্লেনের সঙ্গে বেতার-ক্যামেরা ব্যবহার করে শত্রুপক্ষের বহুবিধ খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। শত্রুর এলাকার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় এরোপ্লেন নিম্নস্থ সকল ব্যাপারের চিত্র বেতারের সাহায্যে দূরবর্তী কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে পারে। স্বীয় শিবিরে অবস্থান করেই সমরনায়ক চোখের উপর দেখতে পাবে শত্রুর পরিকল্পনা, সৈন্য ও অস্ত্রসমাবেশের ব্যবস্থা; শত্রুরাজ্যের নগর রেলওয়ে জাহাজ ইত্যাদি সব কিছুরই জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নেবে একেবারে স্বচক্ষে দেখে। নিরাপদ উচ্চতা দিয়ে উড়ে যাবার সময় বৈমানিক সকল খবর পৌঁছে দেবে নিজেদের দলের ঘাঁটিতে।

কুয়াসাচ্ছন্ন দিনে এরোপ্লেন নির্বিঘ্নে বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করতে পারে— সমুদ্রে জাহাজ অগ্রসর হয়ে কুজ্ঝটিকার আবরণকে অগ্রাহ্য করে। সাধারণ দৃশ্যালোক ভিন্ন ফোটো-সেল লাল-উজানী আলো বা তাপ-রশ্মিতেও সাড়া দিতে সক্ষম। সাধারণ দৃশ্যালোক কুয়াসা ভেদ করতে পারে না কিন্তু তাপরশ্মির সে ক্ষমতা আছে। তাপরশ্মির সাহায্যে ফোটো-ক্যাথোডকে উত্তেজিত করবার ব্যবস্থা থাকলে বেতার-ক্যামেরার মধ্যবর্তিতায় কুয়াসার অন্তরালকে জয় করা চলবে।

অদূর ভবিষ্যতে বেতার-ক্যামেরা কি জাতীয় কাজে লাগতে পারে ও কি ভাবে মানুষের কল্যাণে আসতে পারে সেই সব পরিকল্পনার কিছু আভাস এখানে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সমুদ্রতলের খবর জানবার জন্য ডুবুরিরা জলের নীচে অভিযান করে, তাদের পাল্লা খুব বেশি হলে চার শ ফুট। বিশেষভাবে তৈরি একটা লোহার গোলকের (Bathysphere) ভিতরে বসে উইলিঅম বিবে সমুদ্রতলে চৌদ্দ শ ফুট পর্যন্ত নেমে খোঁজখবর কিছু সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এ রকম করে জলের নীচে যাওয়া বিপজ্জনক ও কঠিন ব্যাপার। বেদীস্ফীয়ারের ভিতর একটি এমিট্রন-ক্যামেরা বসিয়ে দিলে জলে না নেমেও গভীর জলের খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। জলের নীচে থেকে জলমগ্ন জাহাজের উদ্ধারকার্যও এই রকম ব্যবস্থায় সহজে করা যাবে।

লোহা প্রভৃতি ধাতু ও কাঁচের কারখানায় জলন্ত চুল্লীর ভিতরে গলিত পদার্থের কি পরিবর্তন ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রচণ্ড তাপের মধ্যে চোখে নীল কাঁচের চশমা পরে অনেকটা দূর থেকে দেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু তাতেও যে কষ্ট করতে হয় অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে তা দুঃসহ। আবরণ দিয়ে ঢাকা একটা এমিট্রন-ক্যামেরা ফুটন্ত তরল পদার্থের কটাহে বসিয়ে দিলে সে অগ্নিলোকের খবর সহজলভ্য হবে। দূর থেকে নল-বাহিত শীতল তরল পদার্থের প্রবাহ দিয়ে ক্যামেরাকে আবরণের সঙ্গে ঠাণ্ডা রাখার প্রয়োজন হবে— সে কথা বলা বাহুল্য।

অস্ত্রচিকিৎসায় শিক্ষালাভ করবার জন্য শিক্ষার্থীদের অস্ত্রোপচারের সময়ে উপস্থিত থেকে চাক্ষুষ জ্ঞানসঞ্চয় করবার রীতি আছে। কিন্তু অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে অস্ত্রোপচারের খুঁটিনাটি দেখা সম্ভব না হওয়াই স্বাভাবিক। টেবিলের ঠিক উপরে একটা দূরেক্ষণ-ক্যামেরা রেখে দিলে অস্ত্রোপচারের সকল খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীর চোখের সামনে উপস্থিত করা সম্ভব হবে। শিক্ষাদান বিষয়ে এইরূপ ব্যাপক সুবিধার সম্ভাবনা-বিষয়ে আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আমেরিকায় প্যালোমার পর্বতে যে-অতিকায় দূরবীণ শীঘ্রই নির্মিত হবে, তার ভিতরে সরাসরি চোখ না দিয়েও বিশ্বের স্বরূপ দেখবার অনুরূপ সুযোগ পৃথিবীর যে-কোনো দেশে নিজের ঘরে বসেও লাভ করা মোটেই অসম্ভব হবে না। যে-কোনো

বৈজ্ঞানিকপরীক্ষা একই সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে উপস্থাপিত করা চলবে। যে-কোনো বিখ্যাত শিক্ষকের কাছে পাঠ নেওয়া শত সহস্র মাইল দূরে বসেও সম্ভব হবে।

কবিকল্পনার বিরহী যক্ষ মেঘদূতের সাহায্যে প্রিয়াসকাশে কেবল বার্তা প্রেরণই করবে না, বিরহবিধুরার বিষাদমলিন মুখও দর্শন করতে পারবে।